International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-III, May 2023, Page No.61-80
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i3.2023.61-80

প্রত্যক্ষ সম্পর্কে চন্দ্রকীর্তির অভিমত: *প্রসন্নপদা* অবলম্বনে একটি বিশ্লেষণ

গৌরী শঙ্কর দে
প্রাক্তন ছাত্র, এম.এ. (দর্শন), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Among the different means of cognition (prāmaṇa), perception (Pratyakşa) is universally accepted, irrespective of whether he is a philosopher or an ordinary person. In India, although almost every philosophical school admits the validity of perception, they are not unanimous about the nature of perception. Even within Buddhist philosophy, there is a vast difference in opinion regarding the nature of perception, its types, etc. In this paper, I have tried to discuss one of the greatest Mādhyamika Philosopher Candrakīrti's takes on perception following his remarkable work called Prasannapdā. Here in the text, Candrakīrti's discussion of perception has two sides. He first refuted Dignāga's theory of perception, then available, one of the most prominent and rival positions in Buddhist philosophy. In Buddhist epistemology, Dignāga was the pioneer to provide a systematic account of perception according to Sautrāntika-Yogācāra metaphysics — which is opposed to the Madhyamika's position. That's why in Prasannapdā after refuting Dignāga's theory of prāmaṇa in general; he also vehemently criticized Dignāga's theory of perception. While doing so Candrakīrti also describes perception from a common sense (Saṃvṛti) level. It is noteworthy because before Candrakīrti his predecessors, like Nāgārjuna, Buddhapālita, and others only refuted Pramāna from an ultimate point of view; however, remained silent in advocating any positive view regarding prāmaṇa and perception. Candrakīrti was probably the pioneer to describe a positive outlook on perception from a common-sense perspective. In this paper, I have tried to analyse Candrakīrti's criticism as well as his view on the perception from an Mādhyamika point of view.

Keywords: Perception, Candrakīrti, Dignāga, Prasannapdā, Mādhyamika Epistemology, Buddhist Epistemology.

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় দার্শনিক ও ঋষিগণ জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের গুরুত্বকে উপলব্ধি করেছেন এবং তদনুসারে প্রত্যক্ষের স্বরূপ উদ্ঘাটনে সুগভীর ও সূক্ষাতিসূক্ষ বিচার-বিশ্লেষণের নিদর্শন রেখেছেন। ভারতীয় দর্শনে আস্তিক–নাস্তিক নির্বিশেষে প্রায় সকল সম্প্রদায়ই প্রত্যক্ষকে প্রমাণের মর্যাদা দিয়েছেন। এমনকি, নাস্তিক শিরোমণি চার্বাকগণও অনুমানাদি প্রমাণের প্রতিষেধ করলেও তারা প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করেছেন। তবে, সকলেই প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য স্বীকার করলেও প্রত্যক্ষের স্বরূপ

বিষয়ে সকলে সহমত নয়। প্রতিটি দর্শন সম্প্রদায় নিজ নিজ অধিবিদ্যক বা সত্তাতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণের আলোচনা করায় তদনুসারে প্রত্যক্ষের স্বরূপ বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এমনকি, বৌদ্ধ দর্শনের অন্দরেও প্রত্যক্ষ সম্পর্কে মতবৈষম্য বিদ্যমান। এই প্রবন্ধে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক-মাধ্যমিক দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আচার্য চন্দ্রকীর্তির অভিমত আলোচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ প্রমাণশাস্ত্রের ইতিহাসে আচার্য দিঙ্নাগই সর্বপ্রথম সৌত্রান্তিক-যোগাচারবাদসম্মত প্রমাণতত্ত্বের আলোকে প্রত্যক্ষ বিষয়ক অভিমত ব্যক্ত করেন, যা স্পষ্টতই মাধ্যমিক দর্শন বিরোধী। এই হেতুই আচার্য চন্দ্রকীর্তি তাঁর সুবিখ্যাত প্রসন্নপদা নামক মধ্যমকশাস্ত্রবৃত্তিতে দিঙ্নাগীয় প্রমাণতত্ত্বের সামান্যতঃ খন্ডনের অনন্তর দিঙ্নাগসম্মত প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। বলা বাহুল্য, এই আলোচনাবসারে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে চন্দ্রকীর্তির নিজস্ব চিন্তা ভাবনাও পরিস্ফুট হয়েছে।

কাজেই বলা যায়, প্র-সন্নপদায় চন্দ্রকীর্তির প্রত্যক্ষ বিষয়ক আলোচনার দুটি দিক রয়েছে। একটি নঞর্থক দিক অন্যটি সদর্থক। নঞর্থক থেকে তিনি দিঙ্নাগীয় প্রত্যক্ষের খন্ডন করেছেন এবং সদর্থক দিক থেকে তিনি মাধ্যমিক দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ লোকব্যাবহারিক প্রত্যক্ষের বর্ণনা দিয়েছেন।

তবে, মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে দিঙ্নাগের অভিমতের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় থাকলে দিঙ্নাগের প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপিত চন্দ্রকীর্তির আক্রমণের অভিমুখ তথা তাৎপর্য অনুধাবনে উপযোগী হতে পারে। তাই নিম্নে অতিসংক্ষেপে প্রত্যক্ষ বিষয়ে দিঙ্নাগের অভিমত সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পরে।

প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে দিঙ্নাগের অভিমত: বৌদ্ধ প্রমাণশাস্ত্রের অন্যতম পথিকৃৎ হলেন আচার্য দিঙ্নাগ। তিনি যে দু'প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেছেন প্রত্যক্ষ হল তাদের মধ্যে অন্যতম । অন্যটি হল অনুমান। প্রমাণব্যবস্থায় বিশ্বাসী দিঙ্নাগের মতে, জগতে কেবলমাত্র স্বলক্ষণ ও সামান্যলক্ষণ এই দ্বিবিধ প্রমেয় থাকায় তাদের গ্রাহকরূপে যথাক্রমে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয়ই স্বীকৃত। এর অতিরিক্ত জগতে অন্য কোনো প্রমেয় পদার্থ না থাকায় অন্য কোনো প্রমাণ তিনি স্বীকার করেননি।[1] এর মধ্যে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎভাবে স্বলক্ষণকে জানতে পারে এবং অনুমানের দ্বারা সামান্যলক্ষণের জ্ঞান হয়।[2]

দিঙ্নাগ তাঁর ন্যায়মুখ গ্রন্থে প্রত্যক্ষ পদটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন — "অক্ষম্ অক্ষম্ প্রতি বর্ততে ইতি প্রত্যক্ষম্"। অর্থাৎ, প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থেকে উৎপন্ন হওয়ায় একে 'প্রত্যক্ষ' নামে অভিহিত করা হয়। দিঙ্নাগের মতে, বিজ্ঞানের উৎপত্তির প্রতি বিষয় ও ইন্দ্রিয় উভয়ের ভূমিকা থাকলেও একে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নামকরণ করা হয় (বা প্রত্যক্ষ বলা হয়) কেননা ইন্দ্রিয়গুলি হল প্রত্যক্ষের প্রতি অসাধারণ কারণ। দিঙ্নাগ তাই প্রমাণসমুচ্চয়ে বলেছেন –

"অসাধারণহেতুত্বাদক্ষৈস্তদ্ব্যপদিশ্যতে"।[3]

---

[1] প্রত্যক্ষমনুমানং চ প্রমাণে যস্মাদ্ লক্ষণদ্বয়ং।
প্রমেয়ং তত্রসন্ধানে ন প্রমাণান্তরং ন চ।
দিঙ্নাগ, *প্রমাণসমুচ্চয়*, কারিকা-১.৩. পৃষ্ঠা – ১।

[2] স্বলক্ষণবিষয়ং হি প্রত্যক্ষং সামান্যলক্ষণ বিষয়মনুমানমিতি প্রতিপাদয়িষ্যামঃ।
দিঙ্নাগ, *প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি*, পৃষ্ঠা -১।

[3] *প্রমাণসমুচ্চয়*, কারিকা- ১.৩ ক খ, পৃষ্ঠা – ২।

দিঙ্নাগ তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে গিয়ে *প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি*-তে বলেছেন, রূপাদি বিষয়ের দ্বারা এর নামকরণ করে একে 'প্রত্যর্থ' বা 'প্রতিবিষয়' বলা যায় না। কেন-না, রূপাদি বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষের প্রতি সাধারণ কারণ হয়ে থাকে। রূপাদি বিষয়সমূহের সাধারণ কারণত্বের পশ্চাতে দুটি হেতুর উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, রূপাদি বিষয়কে অবলম্বন করে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জন্য চক্ষুর্বিজ্ঞান যেমন উৎপন্ন হয়, তার পরবর্তীকালে সেই একই রূপাদিবিষয়কে অবলম্বন করে মনোবিজ্ঞানও উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ, রূপাদি বিষয় চক্ষুর্বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান উভয়ের উৎপত্তির প্রতি সাধারণ সাধারণ কারণ হয়ে থাকে। আবার দ্বিতীয়ত, রূপাদি বিষয় একাধিকব্যাক্তির দর্শনের প্রতি সাধারণ কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যক্ষের প্রতি অসাধারণ কারণ হয়ে থাকে। দিঙ্নাগের মতে, সাধারণভাবে জগতে অসাধারণ কারণের দ্বারাই পদার্থের নামকরণ হতে দেখা যায়। যেরূপ ভেরীশব্দ, যবাঙ্কুর ইত্যাদি স্থলে অসাধারণ কারণের দ্বারা নামকরণ হতে দেখা যায়।[4] কাজেই, দিঙ্নাগের অভিমত হল, ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ হওয়ায় তদনুসারে একে 'প্রত্যক্ষ' নামে অভিহিত করা হয়; 'প্রতিবিষয়' বা 'প্রত্যর্থ' নামের দ্বারা নয়।

দিঙ্নাগ তাঁর প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থে প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন— "প্রত্যক্ষম কল্পনাপোঢ়ং"।[5] প্রত্যক্ষ হল কল্পনাপোঢ় বা কল্পনা বিযুক্ত জ্ঞান। কাজেই, স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, কল্পনা কী? এর উত্তরে দিঙ্নাগ বলেছেন, কল্পনা হল 'নাম – জাত্যাদিযোজনা'। অভিপ্রায় এই যে, কোনো অর্থ বা বিষয় যা স্বরূপত অব্যপদেশ্য, তা যখন নাম-জাতি ইত্যাদির দ্বারা সম্বন্ধিত হয়, তখন তা বাচক শব্দের দ্বারা অভিলাপযোগ্য হয়ে ওঠে। এইভাবে ওই নির্দিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে নাম-জাতি ইত্যাদির যে যোজনা বা সংযুক্তি তাকেই দিঙ্নাগ কল্পনা নামে অভিহিত করেছেন। আসলে, প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎভাবে কেবল স্বলক্ষণ সত্তাকেই জানতে পারে এবং এই স্বলক্ষণ স্বরূপত পদার্থের অনন্য , অসাধারণ সত্তা (uniquely particular) হওয়ায় তাকে বাচক শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এই হেতু স্বলক্ষণের গ্রাহক প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে কল্পনাপোঢ় বা নাম জাত্যাদির দ্বারা প্রকাশযোগ্য নয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। দিঙ্নাগ কল্পনার পাঁচটি উপাদানের কথা বলছেন। এগুলি হল: নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্য যেগুলি যথাক্রমে বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধিত যদৃচ্ছাশব্দ জাতিশব্দ, গুণশব্দ, ক্রিয়াশব্দ ও দ্রব্যশব্দ গঠনে সহায়তা করে। প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি-তে এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দিঙ্নাগ বলেছেন, যদৃচ্ছাশব্দের ক্ষেত্রে নামের দ্বারা বিশিষ্ট অর্থ বা বিষয় বোধিত হয়ে থাকে যেমন ডিত্থ ইত্যাদি। একইভাবে জাতি-শব্দের ক্ষেত্রে জাতি বিশিষ্ট বিষয় 'গো' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা, গুণ-শব্দের ক্ষেত্রে গুণবিশিষ্ট বিষয় 'শুক্ল' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা, ক্রিয়া-শব্দের ক্ষেত্রে ক্রিয়াবিশিষ্ট বিষয় 'পাচক' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা এবং সর্বোপরি দ্রব্য-শব্দের ক্ষেত্রে দ্রব্যের দ্বারা বিশিষ্ট

[4] অথ কস্মাদ্ দ্বয়াধীনায়ামুৎপত্তৌ প্রত্যক্ষমুচ্যতে ন প্রতিবিষয়ম্.....ন তু বিষয়ৈঃ রূপাদিভিঃ। তথা হি বিষয়া মনোবিজ্ঞানান্যসন্তানিকবিজ্ঞানসাধারণঃ। অসাধারণেন চ ব্যপদেশো দৃষ্টো যথা ভেরী শব্দোব যবাঙ্কুর ইতি *প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি,* পৃষ্ঠা – ২।

[5] *প্রমাণসমুচ্চয়* , কারিকা- ১.৩ গ, পৃষ্ঠা – ২।

অর্থ 'দন্ডী' বা 'বিষাণী' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়।[6] এবং যেখানে এইরূপ কোনো কল্পনা নেই তাকেই প্রত্যক্ষ বলা হয়।[7]

অবশ্য দিঙ্নাগোত্তর কালে আচার্য ধর্মকীর্তি ও তাঁকে অনুসরণ করে অন্যান্য বৌদ্ধ আচার্যগণ প্রত্যক্ষের লক্ষণে কল্পনাপোঢ়ত্বের পাশাপাশি অভ্রান্ত পদের সন্নিবেশ[8] করলেও দিঙ্নাগ অবশ্য পৃথক ভাবে অভ্রান্ত পদের নিবেশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। দিঙ্নাগের মতে, মনস্থ কল্পনা থেকেই ভ্রান্তির উদ্ভব। কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট ভ্রান্ত বিষয়কে সৎ বস্ত রূপে গ্রহণ করার ফলেই তাতে ভ্রান্তি জন্মে। অর্থাৎ কল্পনাশূন্য বা নির্বিকল্পক জ্ঞান মাত্রই অভ্রান্ত হওয়ায় প্রত্যক্ষও স্বরূপত অভ্রান্ত। কাজেই, ভ্রম জ্ঞান, সবিকল্পক জ্ঞান, অনুমানাদি কল্পনার দ্বারা উৎপন্ন হওয়ায় 'কল্পনাপোঢ়' পদের দ্বারাই তাদের থেকে যথার্থ প্রত্যক্ষের ব্যবৃত্তি সম্ভব; তার জন্য প্রত্যক্ষ লক্ষণে 'অভ্রান্ত' পদের অধ্যাহার নিরর্থক।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দিঙ্নাগের প্রত্যক্ষ সম্পর্কীয় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক এইভাবে অতিসংক্ষেপে সূত্রাকারে তুলে ধরা যেতে পারে —

1. প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের ভূমিকাই মুখ্য ; বিষয়ের ভূমিকা গৌণ।
2. প্রত্যক্ষের দ্বারা কেবলমাত্র নীলাদি স্বলক্ষণ পদার্থই গৃহীত হয়; ঘট পটাদি সামান্য লক্ষণ পদার্থ কল্পনার কার্য হওয়ায় প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না।
3. স্বলক্ষণ বস্তুর স্বরূপকে অবিপরীত বা যথার্থ ভাবে তুলে ধরায় তার সাপেক্ষেই প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলে গণ্য করা হয়।
4. প্রত্যক্ষমাত্রই কল্পনাপোঢ় বা বিকল্পশূন্য জ্ঞান; সবিকল্পক জ্ঞান প্রত্যক্ষ হতে পারে না। একইসঙ্গে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কল্পনাপোঢ় হওয়ায় তা অনভিলাপ্য বা বাচক শব্দের দ্বারা প্রকাশ যোগ্য নয়।
5. প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বরূপত অভ্রান্ত; ভ্রম জ্ঞানাদি মাত্রই মনস্থ কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট।

বলা বাহুল্য, আচার্য চন্দ্রকীর্তি তাঁর *প্রসন্নপদায়* দিঙ্নাগসম্মত প্রত্যক্ষের প্রায় সবকটি দিকই কম-বেশি খন্ডন করেছেন।

এখন চন্দ্রকীর্তি কীভাবে দিঙ্নাগের প্রত্যক্ষের খন্ডন করেছেন সেই বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

চন্দ্রকীর্তি কর্তৃক দিঙ্নাগীয় প্রত্যক্ষের খন্ডন: চন্দ্রকীর্তি কর্তৃক দিঙ্নাগের প্রত্যক্ষ লক্ষণের খন্ডনের আলোচনাটিকে ব্যাপকভাবে দুটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, দিঙ্নাগসম্মত প্রত্যক্ষের লক্ষণটি 'ঘটঃ প্রত্যক্ষঃ' ইত্যাদি লোকব্যবহারিক প্রত্যক্ষের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এবং দ্বিতীয়ত, দিঙ্নাগ প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণটি যথার্থ নয়।

১. লৌকিক প্রত্যক্ষের অসন্তোষজনক ব্যাখ্যা: দিঙ্নাগের প্রত্যক্ষ সংক্রান্ত অভিমতের বিরুদ্ধে চন্দ্রকীর্তির প্রথম অভিযোগ হল দিঙ্নাগ 'ঘটঃ প্রত্যক্ষঃ' ইত্যাদি লোকব্যবহারিক প্রত্যক্ষের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। লোকব্যবহারে সাধারণ মানুষ 'ঘটঃ প্রত্যক্ষঃ' অর্থাৎ ঘটাদিকে প্রত্যক্ষ বলে স্বীকার করে থাকেন।

---

[6] যদৃচ্ছাশব্দেষু নান্না বিশিষ্টোঽর্থ উচ্যতে ডিত্থ ইতি। জাতিশব্দেষু জাত্যা গৌরিতি। গুণশব্দেষু গুণেন শুক্ল ইতি। ক্রিয়াশব্দেষু ক্রিয়য়া পাচক ইতি। দ্রব্যশব্দেষু দ্রব্যেণ দন্ডী বিষাণীতি। *প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি*, পৃষ্ঠা – ২।

[7] যত্রৈষা কল্পনা নাস্তি তৎ প্রত্যক্ষম্। তদেব, পৃষ্ঠা -২।

[8] তত্র প্রত্যক্ষম্ কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তম্।
ধর্মকীর্তি, ন্যায়বিন্দু , সূত্র-৪, পৃষ্ঠা – ৪৩।

কিন্তু দিঙ্নাগের অভিমতানুসারে, প্রত্যক্ষ মাত্রই কল্পনাপোঢ় হওয়ায় এবং ঘট পটাদি কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট সামান্যলক্ষণ পদার্থ হওয়ায় তা প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। অথচ দিঙ্নাগ স্বয়ং লোকব্যবহারের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তাঁর প্রমাণতত্ত্বের পরিকল্পনা করেছেন বলে দাবি করেন। স্বাভবিকভাবেই লোকব্যবহারঙ্গভূত ঘটাদির প্রত্যক্ষত্বই দিঙ্নাগসম্মত প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ব্যবস্থিত না হওয়ায় তা অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট।[9] ফলত, দিঙ্নাগের প্রত্যক্ষ লক্ষণ গ্রহণযোগ্য নয়।

এহেন অসুবিধা নিরসনের জন্য পূর্বপক্ষী বলতে পারেন, উপাচার বা গৌণ প্রয়োগের মাধ্যমে 'ঘটঃ প্রত্যক্ষঃ' ইত্যাদি এজাতীয় লোকব্যবহার সুসম্পন্ন হয়। পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যক্ষের দ্বারা পরিছিন্ন (অর্থাৎ বিষয়) হওয়ায় ঘটের উপাদান নীলাদি স্বলক্ষণসমূহই যথার্থ অর্থে প্রত্যক্ষ বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু ঘটাদি কল্পনাপ্রসূত হওয়ায় নীলাদি স্বলক্ষণ ব্যতীত ঘটাদির কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। এক্ষেত্রে (কারণ) নীলাদি স্বলক্ষণের প্রত্যক্ষত্ব (কার্য) ঘটাদিতে উপচরিত করে লোকব্যবহারে ঘটকে প্রত্যক্ষ বলা হয়। ঠিক যেরূপ "বুদ্ধানাং সুখ উৎপাদ" এই স্থলে বুদ্ধের জন্মগ্রহণ নির্বাণোত্তর জরা-মরণাদি দুঃখ থেকে মুক্তি অর্থাৎ ভাবি সুখের হেতু হওয়ায়, ভাবি সুখকে (অর্থাৎ কার্যকে) তার কারণে অর্থাৎ বুদ্ধের জন্মলাভে উপাচারপূর্বক বুদ্ধের জন্মগ্রহণকে সুখের বলা হয়; ঠিক একইভাবে যদিও বাস্তবিকপক্ষে কেবলমাত্র (ঘটের উপাদান) নীলাদি স্বলক্ষণই প্রত্যক্ষের বিষয় হয় তথাপি নীলাদি স্বলক্ষণের (কারণের) প্রত্যক্ষত্ব ঘটে (কার্য) উপাচার করে ঘটকেও প্রত্যক্ষ বলা হয়।[10]

লক্ষণীয় যে, এখানে পূর্বপক্ষী দুবার দুটি ভিন্ন ক্ষেত্রে উপাচারের প্রয়োগ করেছেন। তিনি প্রথমে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় বা প্রমেয় পদার্থে (যেমন রূপাদি স্বলক্ষণে) প্রত্যক্ষত্বের উপাচার করেছেন। দিঙ্নাগ তাঁর প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তিঃ - তে প্রমাণ শব্দটির তিনটি অর্থের উল্লেখ করেছেন। যথা— ১. প্রত্যক্ষ প্রমাণ; ২. প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা প্রমিতি; ৩. প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় বা প্রমেয়। এর মধ্যে প্রমাণরূপ অর্থটিই প্রত্যক্ষ শব্দের মুখ্যার্থ। জ্ঞান বা প্রমিতি এবং বিষয় অর্থে প্রত্যক্ষ শব্দটি গৌণভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিষয় বা প্রমেয়কে গৌণ অর্থে প্রত্যক্ষ বলা হয় কেন-না, তা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা পরিছিন্ন হয়ে থাকে। পুনরায় তিনি দ্বিতীয়বার নীলাদি স্বলক্ষণের প্রত্যক্ষত্ব ঘটে উপচরিত করে 'ঘটঃ প্রত্যক্ষঃ' ইত্যাদি লোকব্যবহারিক প্রত্যক্ষের সঙ্গতি ব্যাখ্যা করেছেন। যাই হোক, দিঙ্নাগের মতে, লোক ব্যবহারে ঘটকে যে প্রত্যক্ষ বলে অভিহিত করা হয় তা ঔপচারিক — বাস্তবিক প্রত্যক্ষ নয়।

কিন্তু চন্দ্রকীর্তি এর বিরোধিতা করে বলেন, "বুদ্ধানাং সুখ উৎপাদ"রূপ দৃষ্টান্তের অনুরূপে দিঙ্নাগ ঘটাদিতে প্রত্যক্ষত্বের যে উপাচার সিদ্ধ করতে চেয়েছেন, তা সমগোত্রীয় নয়। নির্বাণ লাভের অনন্তর উপলভ্যমান সুখের (কার্য) স্বীয় কারণে অর্থাৎ বুদ্ধের জন্মগ্রহণে উপাচার যুক্তিগ্রাহ্য। কারণ উপাচারের অন্যতম শর্ত হল, উপাচারের সম্বন্ধীদ্বয় একত্র দৃষ্ট হবে না বা তারা পরস্পর অসম্বন্ধ হবে। এই স্থলে বুদ্ধের

---

[9] কিং চ ঘটঃ প্রত্যক্ষ ইত্যেবমদিকস্য লৌকিকব্যবহারস্যাসংগ্রহবদনার্যব্যবহারাভ্যুপগমাচ্চ অব্যাপিতা লক্ষণস্যেতি ন যুক্তমেতৎ।

চন্দ্রকীর্তি, নাগার্জুনের মুলমধ্যমকশাস্ত্রের উপরি রচিত *প্রসন্নপদা টীকা,* পৃষ্ঠা - ২৩।

[10] অথ স্যাৎ— ঘটোপাদাননীলাদয়ঃ প্রত্যক্ষাঃ প্রত্যক্ষপ্রমাণ পরিচ্ছেদ্যত্বাৎ। ততশ্চ যথৈব কারণে কর্যোপচারং কৃত্বা বুদ্ধানাং সুখ উৎপাদ ইতি ব্যপদিশ্যতে, এবং প্রত্যক্ষনীলাদিনিমিত্তকোঽপি ঘটঃ কার্যে কারণোপচারং কৃত্বা প্রত্যক্ষ ইতি ব্যপদিশ্যতে। তদেব, পৃষ্ঠা -২৪।

বর্তমান জন্ম (কারণ) সংস্কৃতলক্ষণ অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্মের শত শত দুষ্কর কার্যের হেতু হওয়ায়, তা বস্তুত অসুখই (বা দুঃখ)। ফলত, বাস্তবিক ক্ষেত্রে বুদ্ধের জন্মলাভ (কারণ) বস্তুত দুঃখাত্মক হওয়ার (অর্থাৎ কার্য সুখের অত্যন্ত বিপরীতধর্মী হওয়ার) এক্ষেত্রে কার্য সুখকে তার কারণ অর্থাৎ বুদ্ধের বর্তমান জন্মলাভে উপাচার করে "বুদ্ধানাং সুখ উৎপাদ" এইরুপ কথন যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু ঘটের প্রত্যক্ষত্বের ক্ষেত্রে অবস্থাটি বিপরীত। কেননা ঘটে প্রত্যক্ষত্বের আরোপ করতে হলে (উপাচারের শর্তানুসারে প্রত্যক্ষত্বের বিরোধী) অপ্রত্যক্ষযোগ্য ঘট বলে কিছু থাকতে হবে, যাতে প্রত্যক্ষত্ব আরোপিত হবে।[11] কিন্তু লোক ব্যবহারে ঘটের প্রত্যক্ষত্বই সিদ্ধ। কাজেই, চন্দ্রকীর্তির অভিপ্রায় হল, উপাচারের নিমিত্ত আবশ্যিক শর্তের অভাবে ঘটের প্রত্যক্ষত্ব কোনোভাবেই সিদ্ধ হতে পারে না।

এর প্রত্যুত্তরে দিঙ্নাগ অবশ্য পরমার্থ স্তরীয় যুক্তির অবতারণা করে বলতে পারেন, পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে রূপাদি স্বলক্ষণ ব্যতীত ঘটের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা না থাকায় (তা কল্পনাপ্রসূত হওয়ার) ঘটে প্রত্যক্ষত্বের উপাচারে কোনো বাধা থাকে না। কিন্তু চন্দ্রকীর্তির অভিযোগ হল, বস্তুত এর দ্বারা সমস্যার সমাধান তো হয় না বরং দিঙ্নাগ উপাচার প্রয়োগের সম্ভাবনাকেই কার্যত একপ্রকার অসম্ভব করে তোলেন। কেন-না, উপাচার প্রয়োগের জন্য আবশ্যিকভাবে একটি আধার বা অধিষ্ঠান প্রয়োজন, যায় উপর বিশেষণ বা ধর্মটি উপচরিত হবে। ঠিক যেমন খরবিষাণ অলীক পদার্থ হওয়ার, তার শিং বা বিষাণে তীক্ষ্ণতার উপাচার অবাস্তব; তেমনই দিঙ্নাগের অভিমত স্বীকারপূর্বক যদি বলা হয়, রূপাদি স্বলক্ষণ ব্যতীত ঘটাদির স্বতন্ত্র সত্তা নেই, তাহলে অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ের অভাবে ঘটে প্রত্যক্ষত্বের (বলা বাহুল্য কোনো ধর্মেরই) আরোপ সম্ভবপর নয়।[12] কাজেই, উপাচারের মাধ্যমে লোকব্যবহারাঙ্গভূত ঘটের প্রত্যক্ষত্ব সিদ্ধির দিঙ্নাগের যে আকাঙ্ক্ষা তা অপূর্ণই থেকে যায়।

শুধু তাই নয়, দিঙ্নাগের অন্যতম ত্রুটি হল, তিনি পরমার্থ ও সংবৃতিসত্যের বিভাজনকে সংমিশ্রিত করে ফেলেছেন। বিচার বা পরীক্ষা কেবলমাত্র পরমার্থ বা তত্ত্বের সাপেক্ষে প্রাসঙ্গিক; অবিদ্যাপ্রসূত সংবৃতিস্তরে বা লোকব্যবহারে পদার্থসমূহরের যথার্থ স্বরূপ বিচার ব্যতিরেকেই তাকে গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া, লোকব্যবহারিক বা সাংবৃতিক সত্তার ক্ষেত্রে পরীক্ষা বা বিচারের প্রয়োগেকে অনুমোদন দিলে 'পর দিঙ্নাগসম্মত স্বলক্ষণ পদার্থের অস্তিত্বও একপ্রকার প্রশ্ন চিহ্নের মুখে পতিত হবে। কারণ, যে বিচার বা পরীক্ষার দ্বারা দিঙ্নাগ স্বলক্ষণ ব্যতিরিক্ত ঘটাদির অনস্তিত্ব প্রতিপাদন করেছেন, সেই একই পরীক্ষা বা বিচারের দ্বারা রূপাদি স্বলক্ষণও যে পৃথিবী, বায়ু ইত্যাদি পরমাণু সংঘাত ব্যতীত কিছু নয়— তাও সিদ্ধ হয়।

---

[11] নৈবং বিষয়ে উপাচারো যুক্তঃ। উৎপাদো হি লোকে সুখব্যতিরেকেণোপলব্ধঃ, স চ সংস্কৃতলক্ষণস্বভাবত্বাদনেকদুষ্করশতহেতুত্বাদসুখ এব, স সুখ ইতি ব্যপদিশ্যমানঃ অসম্বন্ধ এবেত্যেংবিষয়ে যুক্ত উপাচারঃ। ঘট প্রত্যক্ষ ইত্যত্র তু ন হি ঘটো নাম কৃশ্চিদ্যোহপ্রত্যক্ষঃ পৃথগুপলব্ধো যস্যোপচারাৎ প্রত্যক্ষত্বং স্যাৎ। তদেব, পৃষ্ঠা -২৪।

[12] নীলাদিব্যতিরিক্তস্য ঘটস্যাভাবাদৌপচারিকং প্রত্যক্ষত্বমিতি চেৎ, এবমপি সুতরামুপচারো ন যুক্তঃ, উপচর্যমাণস্যাশ্রয়স্যাভাবাৎ। ন হি খরবিষাণে তৈক্ষ্ণ্যমুপচর্যতে। তদেব, পৃষ্ঠা-২৪।

অর্থাৎ, বিচারের দ্বারা স্বলক্ষণের যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই তা ব্যবস্থিত হয়।[13] এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মাধ্যমিকাচার্য আর্যদেব তাঁর চতুঃশতকে বলেছেন —

"রূপাদিব্যতিরেকেণ যথা কুম্ভো ন বিদ্যতে।
বায্বাদিব্যতিরেকেণ তথা রূপং ন বিদ্যতে ।।"[14]

অর্থাৎ যেরূপ রূপাদি স্বলক্ষণ ব্যতিরেকে কুম্ভের বা ঘটের কোনো অস্তিত্ব নেই, ঠিক তেমনই বায়ু ইত্যাদি পরমাণু ছাড়া রূপাদি স্বলক্ষণেরও কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই।

দিঙ্নাগের বিরুদ্ধে চন্দ্রকীর্তির অভিযোগের সারমর্ম হল, পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে নীলাদি স্বলক্ষণ ব্যতীত ঘটাদির কোনো সত্তা না থাকায়, তাতে যদি প্রত্যক্ষত্বের উপাচার স্বীকার করা হয়, তাহলে একই যুক্তির দ্বারা দিঙ্নাগের নিজের বক্তব্য অর্থাৎ স্বলক্ষণ পারমার্থিক সৎ এবং সেগুলি প্রত্যক্ষের দ্বারা গৃহীত হয় — তারও কোনো সারবত্তা থাকে না। "অনেক দ্রব্যোৎপাদৎত্বাৎ তৎ স্বায়তনে সামান্যবিষয়ম্ উক্তম্ ন তু ভিন্নেষ্বভেদকল্পনাৎ"[15] — *প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি*-তে উল্লেখিত দিঙ্নাগের এইরূপ বক্তব্য থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, তিনি যখন প্রত্যক্ষের বিষয়রূপে স্বলক্ষণের কথা হয় তা দ্রব্য-স্বলক্ষণ নয়; বরং আয়তন-স্বলক্ষণকে বোঝায়। অভিধার্মিক ব্যাখ্যা অনুসারে, প্রতিটি দ্রব্য পৃথিবী, অপ, তেজ ও বায়ু এই চারটি মহাভূত এবং রূপ, রস, গন্ধ ও স্প্রষ্টব্য এই চারটি ভৌতিকের সমহারের গঠিত। কাজেই, বিচার বা পরীক্ষার দ্বারা (ঘট-পটাদি সামান্যলক্ষণের মতো) পৃথিবী, অপ ইত্যাদি পরমাণুর অতিরিক্ত যে স্বলক্ষণের কোনো সত্তা নেই তা সিদ্ধ হয় এবং একইসঙ্গে এই সকল পরমাণু অতীন্দ্রিয় বা প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। ফলত, সেক্ষেত্রে স্বলক্ষণগুলি প্রত্যক্ষের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে গৃহীত হয় এমন বলা যায় না বা সেক্ষেত্রে স্বলক্ষণগুলিতেও প্রত্যক্ষত্বের উপাচার স্বীকার করতে হবে — যা স্পষ্টতই দিঙ্নাগের বক্তব্যের বিরোধী। তাই চন্দ্রকীর্তির সিদ্ধান্ত হল, লোকব্যবহারে যদি নীলাদি স্বলক্ষণকে প্রত্যক্ষ বলা হয় তাহলে ঘটাদি সামান্যলক্ষণের প্রত্যক্ষত্বও অবশ্য স্বীকার্য।

তবে চন্দ্রকীর্তি এবিষয়ে সতর্ক করেছেন যে, ঘটাদিকে যখন প্রত্যক্ষ বলা হয় তখন তা লোকব্যবহার বা সংবৃতি সত্যের আলোকেই সত্য ; পরমার্থ বা তত্ত্ববিদের দৃষ্টি থেকে নয়। কেন-না, তত্ত্ববিদ বা তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে নীলাদি স্বলক্ষণ হোক অথবা ঘটাদি সামান্যলক্ষণ — সমস্ত কিছুর প্রত্যক্ষত্বই অসিদ্ধ।[16] এইপ্রসঙ্গে আর্যদেব তাঁর *চতুঃশতক* গ্রন্থে বলেছেন—

---

[13] লোকব্যবহারঙ্গভূতো ঘটো যদি নীলাদিব্যতিরিক্তো নাস্তীতি কৃত্বা তস্যোপচারিকং প্রত্যক্ষত্বং পরিকল্প্যতে, নন্বেবং সতি পৃথিব্যাদিব্যতিরেকেণ নীলাদিকমপি নাস্তীতি নীলাদেরস্যোপচারিকং প্রত্যক্ষত্বং কল্পতাম্। তদেব, পৃষ্ঠা-২৪।

[14] *চতুঃশতক*, কারিকা- ১৪.১৪

[15] *প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি*, পৃষ্ঠা-২।

[16] তত্ত্ববিদপেক্ষয়া হি—প্রত্যক্ষত্বং ঘটাদিনাং নীলাদীনাং চ নেষ্যতে। লোকসংবৃত্যা ত্বভ্যুপগন্তব্যমেব প্রত্যক্ষত্বং ঘটাদীনাম্। প্রসন্নপদা, পৃষ্ঠা-২৪।

"সর্ব এব ঘটোঽদৃষ্টো রূপে দৃষ্টে হি জয়তে।
ব্রুয়াৎকস্তত্ত্ববিন্নাম ঘটঃ প্রত্যক্ষ ইত্যপি।।
এতেনৈব বিচারেণ সুগন্ধি মধুরং মৃদু।
প্রতিষেধয়িতব্যানি সর্বাণ্যুত্তমবুদ্ধিনা।।"[17]

অর্থাৎ যখন রূপ দৃষ্ট হয় তখনও সম্পূর্ণ ঘটের প্রত্যক্ষ হয় না।তাই এমন কোন তত্ত্ববিদ আছেন যিনি ঘট প্রত্যক্ষ এমন বলবেন? এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চন্দ্রকীর্তি *চতুঃশতকটীকা*-য় বলেছেন, রূপ দৃষ্ট হলেও সম্পূর্ণ ঘটের প্রত্যক্ষ হয় না। কেন-না, আভিধার্মিক ব্যাখ্যানুসারে, ঘটে অষ্টদ্রব্যত্ব আছে — পৃথিব্যাদি চতুর্মহাভূত ও রূপাদি চারটি ভৌতিক। এর মধ্যে চক্ষুর দ্বারা কেবল রূপের প্রত্যক্ষ হলেও বিষয়ভেদবশত গন্ধাদির প্রত্যক্ষ হয় না।[18] এইভাবে বিচারের দ্বারা উত্তম পুরুষ বা তত্ত্বজ্ঞানীগণ সুগন্ধাদি ঘ্রাণজ বিষয়, মধু ইত্যাদি রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এবং মৃদু ইত্যাদি স্পর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষও খন্ডন করেছেন।

স্পষ্টতই, চন্দ্রকীর্তির মতে, সংবৃতি ও পরমার্থ এই সত্যদ্বয়ের প্রেক্ষিতেই প্রত্যক্ষের ধারণাকে বুঝতে হবে। তত্ত্ব জ্ঞানীর প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে বা পরমার্থ সত্যের সাপেক্ষে নীলাদি স্বলক্ষণ অথবা ঘটাদি সামান্যলক্ষণ কোনো পদার্থেই প্রত্যক্ষত্ব সিদ্ধ না হলেও, অবিচারপ্রসিদ্ধ সংবৃতি স্তরে বা লোকব্যবহারে রূপাদি স্বলক্ষণের মতো ঘটাদি সামান্যলক্ষণের প্রত্যক্ষত্বও অবশ্য স্বীকার্য। আর দিঙ্নাগ এই লোকব্যবহারের অনুসারী ঘটাদির প্রত্যক্ষের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ হওয়ার তাঁর মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয় — এটাই চন্দ্রকীর্তির অভিপ্রায়।

২. **চন্দ্রকীর্তি কর্তৃক দিঙ্নাগের প্রত্যক্ষের লক্ষণ খন্ডন:** চন্দ্রকীর্তি দিঙ্নাগের প্রত্যক্ষের লক্ষণটি দুভাবে খন্ডন করেছেন । তিনি প্রথমে দেখিয়েছেন যে দিঙ্নাগ যেভাবে প্রত্যক্ষ শব্দের বুৎপাদন করেছেন তা যথার্থ নয় এবং তারপর তিনি প্রত্যক্ষের কল্পনাপোঢ়ত্বের খন্ডন করেছেন।

২.১ দিঙ্নাগসম্মত প্রত্যক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তি খন্ডন: চন্দ্রকীর্তি কর্তৃক দিঙ্নাগের প্রত্যক্ষ লক্ষণের খন্ডনের আলোচনাটি প্রত্যক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় সংক্রান্ত আলোচনার অলিন্দেই কম বেশি আবর্তিত হয়েছে। তবে আলোচনার গভীরে প্রবেশের পূর্বে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, চন্দ্রকীর্তি *স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও* প্রত্যক্ষ শব্দের বিগ্রহবাক্য কীরূপ হওয়া উচিৎ সেই বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। আসলে, প্রত্যক্ষ শব্দটির ব্যুৎপত্তি কেমন হওয়া উচিৎ সেই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ও অ-বৌদ্ধ নির্বিশেষে সমগ্র ভারতীয় দর্শনে তীব্র মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ শব্দটি দু'ধরণের বিগ্রহবাক্য লক্ষ্য করা। যথা — ১. 'অক্ষম্ অক্ষম্ প্রতি বর্ততে ইতি প্রত্যক্ষম্'। এবং ২. 'প্রতিগতম্ অক্ষম্ আশ্রিতম্ ইতি প্রত্যক্ষম্'। এর মধ্যে দিঙ্নাগ প্রথমটির অনুসরণ করলেও চন্দ্রকীর্তি দ্বিতীয়টির পক্ষপাতী। আমরা পূর্বে দেখেছি, দিঙ্নাগ তাঁর ন্যায়মুখ গ্রন্থে 'প্রত্যক্ষ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে "অক্ষম্ অক্ষম্ প্রতি বর্ততে ইতি

---

[17] চতুঃশতক, কারিকা- ১৩.১-২।

[18] অপি শব্দেন তদুপাদাননীলাদিরপি প্রত্যক্ষ ইতি কস্তত্ত্বজ্ঞো ব্রুয়াৎ।ঘটস্য দ্রব্যাষ্টকত্বাৎ। চক্ষুষা হ্যকে রূপং দৃশ্যতে ন গন্ধাদি। বিষয়াভেদাৎ। তস্মান্ন সর্বো ঘটশ্চক্ষুষা দৃষ্ট ইতি।
চন্দ্রকীর্তি, আর্যদেব রচিত চতুঃশতক এর উপরি চতুঃশতকটীকা, পৃষ্ঠা- ৯২।

প্রত্যক্ষম্"— এইভাবে 'প্রত্যক্ষ' শব্দটির বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব সমাস স্বীকার করেছেন। কিন্তু অসুবিধা হল, 'প্রত্যক্ষ' শব্দটি যদি এইরূপ অব্যয়ীভাব সমাস নিষ্পন্ন হয়, তাহলে 'প্রত্যক্ষ' শব্দটি অব্যয় হয়ে পড়ায় তা নিত্য ক্লীবলিঙ্গ হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে 'প্রত্যক্ষঃ বৃক্ষঃ', 'প্রত্যক্ষা নদী' ইত্যাদি পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গান্ত প্রয়োগ অসাধু হয়ে পড়বে। এই হেতুই পরবর্তীকালের আচার্যগণ, যেমন ধর্মোত্তর প্রমুখ, দিঙ্নাগসম্মত 'প্রত্যক্ষ' শব্দের 'অক্ষম্ অক্ষম্ প্রতি বর্ততে' এইরূপ বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব সমাস পরিত্যাগ করে 'প্রতিগতম্ অক্ষম্ আশ্রিতম্ ইতি প্রত্যক্ষম্' - এইরূপ তৎপুরুষ সমাস স্বীকার করেছেন। আচার্য ধর্মোত্তর তাঁর ন্যায়বিন্দুটীকা-য় এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে 'প্রত্যক্ষ' শব্দটির তৎপুরুষ সমাস স্বীকার করায় তা নিত্য ক্লীবলিঙ্গ হয় না। বরং 'প্রত্যক্ষ' শব্দটির অভিধেয়ের লিঙ্গানুসারেই 'প্রত্যক্ষ' পদটির লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। ফলত, সেক্ষেত্রে 'ফলম্ প্রত্যক্ষম্' এইরূপ ক্লীবলিঙ্গান্ত প্রয়োগের মতো 'বৃক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ' কিংবা 'নদী প্রত্যক্ষা' ইত্যাদি পুংলিঙ্গান্ত বা স্ত্রী লিঙ্গান্ত প্রয়োগও সাধু হয়। চন্দ্রকীর্তি কর্তৃক দিঙ্নাগের 'অক্ষম্ অক্ষম্ প্রতি বর্ততে' এহেন ব্যুৎপত্তি পরিত্যাগ করে 'প্রতিগতম্ অক্ষম্ অস্মিন্' প্রত্যক্ষ শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকারের পশ্চাতে *খুব সম্ভবত* এটাও অন্যতম কারণ হতে পারে।

যাই হোক্, আচার্য চন্দ্রকীর্তি এই প্রসঙ্গে লোকব্যবহারে প্রত্যক্ষ বলতে কী বোঝায়? - তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, "অপরোক্ষার্থবাচিত্বাৎ প্রত্যক্ষশব্দস্য সাক্ষাদভিমুখোঽর্থঃ প্রত্যক্ষঃ — প্রতিগতমক্ষমস্মিন্নিতি কৃত্বা ঘটনীলাদীনামপরোক্ষাণাং প্রত্যক্ষত্বং সিদ্ধিং ভবতি।"[19] চন্দ্রকীর্তির বক্তব্য হল, আমরা যদি লোকব্যবহারের দিকে তাকায় তাহলে দেখতে পাবো যে, লোকব্যবহারের অপরোক্ষার্থ বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে গৃহীত বিষয়কেই 'প্রত্যক্ষ' বলে অভিহিত করা হয়। তাই চন্দ্রকীর্তির অভিমত হল, সেই লোকব্যবহারের অনুসারে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ অভিমুখে উপস্থিত অর্থ বা বিষয়কেই প্রত্যক্ষ বলা সমীচিন। আর এক্ষেত্রে 'প্রতিগতম্ অক্ষম্ অস্মিন্' অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়সকল যার দিকে (অর্থাৎ, যে বিষয়ের দিকে) ধাবিত হয়, তাই প্রত্যক্ষ — এইরূপ ব্যুৎপত্তির দ্বারা ঘটাদি বিষয়ই যে প্রত্যক্ষ তা সিদ্ধ হয়। কাজেই, সেই বিষয় — তা নীলাদি স্বলক্ষণ পদার্থ হোক্ অথবা ঘটাদি সামান্যলক্ষণ - যা কিন্তু অপরোক্ষ বা ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ অভিমুখে অবস্থিত, তা 'প্রত্যক্ষ' পদবাচ্য। আর এই নীল-ঘটাদি বিষয়ের গ্রাহক জ্ঞানকেও গৌণ অর্থে প্রত্যক্ষ বলা যায়। যেরূপ তৃণ, তুষ ইত্যাদিকে অগ্নিতে দগ্ধ করলে তাকেও গৌণ অর্থে অগ্নি বলে অভিহিত করা হয়; ঠিক তেমনি বিষয়গ্রাহক গ্রাহক জ্ঞান গৌণ অর্থে প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত করা হয়[20]। স্পষ্টতই, দিঙ্নাগের সঙ্গে চন্দ্রকীর্তির সুস্পষ্ট মত পার্থক্য বিদ্যমান। দিঙ্নাগের মতে জ্ঞানই যেখানে প্রত্যক্ষ শব্দের মুখ্যার্থ সেখানে চন্দ্রকীর্তির মতে জ্ঞানীভূত বিষয় বা অর্থই প্রত্যক্ষ পদের মুখ্যার্থ। অন্যদিকে বিষয়গ্রাহকজ্ঞান কেবল গৌণ অর্থেই জ্ঞান পদবাচ্য।

শুধু তাই নয়, লোকব্যবহারে প্রত্যক্ষ বলতে ঘটাদি প্রত্যক্ষের বিষয়কেই বোঝায় বলে তার দ্বারাই দিঙ্নাগের ব্যুৎপত্তি যে গ্রহণযোগ্য নয় তা সিদ্ধ হয়। কেন-না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না বরং নীল-ঘটাদি বিষয়ই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়ে থাকে। এর থেকেই সুস্পষ্ট হয় যে, দিঙ্নাগের 'অক্ষম্ অক্ষম্

[19] *প্রসন্নপদা,* পৃষ্ঠা -২৪।

[20] তৎপরিচ্ছেদকস্য জ্ঞানস্য তৃণতুষাগ্নিবৎ প্রত্যক্ষকারণত্বাৎ প্রত্যক্ষত্বং ব্যপদিশ্যতে। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৪।

প্রতি বর্ততে' রূপ ব্যুৎপত্তি যথার্থ নয় বরং এর যথার্থ ব্যুৎপত্তি হওয়া উচিত ছিল 'অর্থম্ অর্থম্ প্রতি বর্ততে' বা 'বিষয়ম্ বিষয়ম্ প্রতি বর্ততে'।[21]

এর প্রত্যুত্তরে দিঙ্নাগ অবশ্য বলতে পারেন, বিজ্ঞানের উৎপত্তির প্রতি বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের উভয়ের ভূমিকা থাকলেও একে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নামকরণ করা হয় (বা প্রত্যক্ষ বলা হয়) কেন-না, ইন্দ্রিয়গুলি হল প্রত্যক্ষের প্রতি অসাধারণ কারণ হয়; কিন্তু বিষয়গুলি সাধারণ কারণ হওয়ায় একে বিষয়ের দ্বারা নামকরণ করে 'প্রত্যর্থ ' বা 'প্রতিবিষয়' বলা হয় না এই কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এখন এর বিরুদ্ধে চন্দ্রকীর্তির উত্থাপিত আপত্তিকে সম্যকভাবে বুঝতে হলে প্রত্যক্ষের এই ইন্দ্রিয়পরক নামকরণের প্রেক্ষাপটকে বুঝতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রত্যক্ষের নামকরণের ক্ষেত্রে দিঙ্নাগ বসুবন্ধু রচিত *অভিধর্মকোশ*-এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। *অভিধর্মকোশে* বলা হয়েছে –

"তদ্বিকারবিকারিত্বাদবশ্রয়াশ্চক্ষুরাদয়ঃ।
অতোঽসাধারণত্বাচ্চ বিজ্ঞানং তৈর্নিরুচ্যতে।।"[22]

অর্থাৎ, এক্ষেত্রে বসুবন্ধু চক্ষুর্বিজ্ঞানদিকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নামকরণের পশ্চাতে দুটি হেতুর উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল – (১) তদ্বিকারবিকারিত্ব এবং (২) অসাধারণকারণত্ব। নিম্নে অতিসংক্ষেপে এই দুটি হেতু সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) প্রথম হেতুর সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বসুবন্ধু বলেন যে, ইন্দ্রিয়গুলি বিজ্ঞানের আশ্রয়। ইন্দ্রিয়গুলির বিকারের বা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তজ্জন্য চক্ষুর্বিজ্ঞানাদরও বিকার ঘটে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চক্ষুরাদিতে যখন অঞ্জনাদি লেপিত থাকে বা তা যখন চরণু ইত্যাদির দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে অথবা ইন্দ্রিয়গুলি যখন পটু বা মন্দ হয়, তখন তদনুসারেই চক্ষুরাদি বিজ্ঞানগুলির মধ্যেও বিকার বা তারতম্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু এর বিপরীতে রূপাদি বিষয়গুলির বিজ্ঞানের বিকারে কোনো ভূমিকা নেই। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ইন্দ্রিয়গুলিই চক্ষুর্বিজ্ঞানাদির আশ্রয়, রূপাদি বিষয় সমূহ নয়।[23]

(২) চক্ষুর্বিজ্ঞানাদিকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নামকরণের পশ্চাতে বসুবন্ধু উল্লিখিত দ্বিতীয় হেতু হল ইন্দ্রিয়গুলির অসাধারণত্ব বা অসাধারণকারণত্ব। কেননা, চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয় কেবলমাত্র চক্ষুর্বিজ্ঞানেরই আশ্রয় হয়; শ্রোত্রবিজ্ঞানাদি অন্য বিজ্ঞানের আশ্রয় হয় না। কিন্তু রূপাদি বিষয় যেমন চক্ষুর্বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে, তেমনি মনোবিজ্ঞানেরও বিষয় হতে পারে। ফলত, রূপাদি সাধারণ কারণের বিপরীতে চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলি বিজ্ঞানগুলির আশ্রয় বা অসাধারণ কারণ হওয়ায়, তার দ্বারাই বিজ্ঞানগুলির অভিধান করা হয়। ঠিক যেরূপ ভেরীশব্দ, যবাঙ্কুর ইত্যাদির ক্ষেত্রে অসাধারণ কারণের দ্বারা নামকরণ দেখা যায়।[24]

লক্ষণীয় যে, প্রত্যক্ষের নামকরণ প্রসঙ্গে চন্দ্রকীর্তির উল্লেখিত পূর্বপক্ষীর কণ্ঠেও প্রায় অবিকল কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। পূর্বপক্ষীর বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে চন্দ্রকীর্তি *প্রসন্নপদা*-য় বলেছেন—

---

[21] যস্তু অক্ষমক্ষং প্রতি বর্ততে ইতি প্রত্যক্ষশব্দং বুৎপাদয়তি, তস্য জ্ঞানস্যেন্দ্রিয়াবিষয়ত্বাদ বিষয়বিষয়ত্বাচ্চ ন যুক্তা ব্যুৎপত্তিঃ। প্রতিবিষয়ং তু স্যাৎ প্রত্যর্থমিতি বা। তদেব, পৃষ্ঠা – ২৪।

[22] বসুবন্ধু, *অভিধর্মকোশ,* কারিকা-১.৪৫, পৃষ্ঠা- ১২৬-২৭।

[23] বসুবন্ধু, *অভিধর্মকোশভাষ্য*, পৃষ্ঠা- ১২৬।

[24] তদেব, পৃষ্ঠা- ১।

> যথা উভয়াধীনায়ামপি বিজ্ঞানপ্রবৃত্তৌ আশ্রয়স্য পটুমন্দতানুবিধানাদ্ বিজ্ঞানানাং তদ্বিকারবিকারিত্বাদাশ্রয়েণেব ব্যপদেশো ভবতি চক্ষুর্বিজ্ঞানমিতি, এবং যদ্যপি অর্থমর্থং প্রতি বর্ততে, তথাপি অক্ষমক্ষমাশ্রিত্য বর্তমানং বিজ্ঞানমাশ্রয়েণ ব্যপদেশাৎ প্রত্যক্ষমিতি ভবিষ্যতি।দৃষ্টৌ হি অসাধারণেন ব্যপদেশো ভেরীশব্দো যবাঙ্কুর ইতি।[25]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, চন্দ্রকীর্তি এখানে দিঙ্নাগের কর্তৃক প্রত্যক্ষকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নামকরণের কারণ অনুসন্ধান গিয়ে আলোচনার শিকড়ে অভিযান করেছেন। অর্থাৎ দিঙ্নাগ নিজে *অভিধর্মকোশে* উল্লেখিত চক্ষুরাদি বিজ্ঞানের ইন্দ্রিয়প্রাধান্য সূচক নামকরণ হেতুরূপে বর্ণিত যে যুক্তির দ্বারা (বিশেষত দ্বিতীয় যুক্তিটির) প্রভাবিত হয়ে প্রত্যক্ষকেও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নামকরণে প্রযত্নশীল হয়েছিলেন তার মূলানুগ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। তবে দিঙ্নাগ কেবলমাত্র দ্বিতীয় হেতুর উল্লেখ করলেও চন্দ্রকীর্তি উভয় হেতুর উল্লেখ করেছেন। এখানে চন্দ্রকীর্তি উল্লেখিত "*আশ্রয়স্য পটুমন্দতানুবিধানাদ্ বিজ্ঞানানাং তদ্বিকারবিকারিত্বাদাশ্রয়েণেব ব্যপদেশো ভবতি চক্ষুর্বিজ্ঞানমিতি*" অংশের সঙ্গে বসুবন্ধোক্ত "*তদ্বিকারবিকারিত্ব*" এবং "*অক্ষমক্ষমাশ্রিত্য বর্তমানং বিজ্ঞানমাশ্রয়েণ ব্যপদেশাৎ প্রত্যক্ষমিতি ভবিষ্যতি। দৃষ্টৌ হি অসাধারণেন ব্যপদেশো ভেরীশব্দো যবাঙ্কুর ইতি।*" অংশের সঙ্গে "অসাধারণ কারণত্বে"র সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু দিঙ্নাগের বিরুদ্ধে চন্দ্রকীর্তির আপত্তি হল, এইভাবে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চক্ষুর্বিজ্ঞানাদিকে নামকরণের পশ্চাতে আচার্য বসুবন্ধুর যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও দিঙ্নাগের প্রমাণতত্ত্বের গঠন এমনি যে সেখানে প্রত্যক্ষকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নামকরণের কোনো আবশ্যকতা নেই। অভিপ্রায় এই যে, বিজ্ঞানগুলিকে যদি বিষয়ের দ্বারা নির্দেশ করে রূপ বিজ্ঞান ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়, সেক্ষেত্রে চক্ষুর্বিজ্ঞানাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়বিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের প্রভেদ করা দুষ্কর হয়ে পড়বে। কেন-না, যে রূপাদি বিষয়কে আলম্বন করে চক্ষুর্বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তার পরবর্তীক্ষণে সেই একই রূপাদিকে বিষয় করে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় রূপবিজ্ঞান নাম উচ্চারিত হলে স্বাভাবিক ভাবেই শ্রোতার মনে এমন প্রশ্নের উদয় হবে যে, এই রূপবিজ্ঞান কি চক্ষুরাদি রুপীন্দ্রিয়জন্য অথবা মনোজন্য? ফলত, এহেন অসুবিধা নিরসনের জন্য বিজ্ঞানকে যদি বিষয়ের দ্বারা নামকরণ না করে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সূচিত করা হয়, তাহলে মনোবিজ্ঞান চক্ষুর্বিজ্ঞানাদির বিষয়ে প্রবৃত্ত হলেও তাদের মধ্যে অনায়াসে প্রভেদ করা সম্ভব।[26] তাই চন্দ্রকীর্তির অভিমত হল, রূপীন্দ্রিয় বিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের প্রভেদ নিরূপণের স্বার্থে চক্ষুর্বিজ্ঞানাদিকে স্বীয় আশ্রয় বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নামকরণ শ্রেয়। কিন্তু দিঙ্নাগের প্রমাণতত্ত্বের গঠনই এমন যে, সেখানে প্রমাণগুলি প্রমেয় পরতন্ত্র হওয়ায় অর্থাৎ স্বলক্ষণ ও সামান্যলক্ষণরূপ প্রমেয়দ্বয় নির্দিষ্ট প্রমাণের দ্বারা গৃহীত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রমেয় বা বিষয়ের দ্বারাই প্রমাণের লক্ষণ প্রদান সম্ভব। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রমেয়ের অনুকারিতা বা বিষয়-সারূপ্যের দ্বারাই প্রমাণের আত্মভাব বা স্বরূপ নির্ধারিত হয়; ফলত তার জন্য ইন্দ্রিয়ের ব্যপদেশ্যত্ব নিষ্প্রয়োজন। একইসঙ্গে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ দুটি যথাক্রমে স্বলক্ষণ ও সামান্যলক্ষণের গ্রাহক হওয়ায়, সেই একই প্রমেয়ের

---

[25] *প্রসন্নপদা*, পৃষ্ঠা- ২৪।

[26] নৈতৎ পূর্বেণ তুল্যম্। তত্র হি বিষয়েণ বিজ্ঞানে ব্যপদিশ্যমানে রূপবিজ্ঞানমিত্যেবমাদিনা বিজ্ঞানষটকস্য ভেদো নোপদর্শিতঃ স্যাৎ, মনোবিজ্ঞানস্য চক্ষুরাদিবিজ্ঞানৈঃ সহৈকবিষয়প্রবৃত্তত্বাৎ। তথ হি নীলাদিবিজ্ঞানষটেক বিজ্ঞানমিত্যুক্তে সাকাঙ্ক্ষ এব প্রত্যয়াজ্জায়তে কিমেতদ্রূপীন্দ্রিয়জং বিজ্ঞানমাহোস্বিন্মানসমিতি। আশ্রয়েণ তু ব্যপদেশো মনোবিজ্ঞানস্য চক্ষুরাদিবিজ্ঞানবিষয়ে প্রবৃত্তিসম্ভবেঽপি পরস্পরভেদঃ সিদ্ধো ভবতি। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪-২৫।

দ্বারাই প্রমাণের দিত্ব সংখ্যাও ব্যবস্থিত হয়।[27] শুধু তাই নয়, দিঙ্নাগের মতে, প্রত্যক্ষমাত্রই কল্পনাপোঢ় হওয়ায় এবং অনুমানাদি কল্পনাপ্রসূত হওয়ায় এর দ্বারাই প্রত্যক্ষ থেকে অনুমানের বৈলক্ষণ সূচিত হয়। তার জন্য ইন্দ্রিয়ের অসাধারণ কারণত্বের কল্পনার দ্বারা প্রত্যক্ষের ব্যপদেশের কোনো উপযোগিতা নেই।[28] তাই চন্দ্রকীর্তির সিদ্ধান্ত হল, প্রমাণের স্বরুপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষের অভিধান অনাবশ্যক বরং বিষয়ের দ্বারাই প্রত্যক্ষাদির অভিধান যুক্তিসঙ্গত।

এর প্রত্যুত্তরে দিঙ্নাগের সপক্ষে কেউ বলতে পারেন যে, লোকে "প্রত্যক্ষ"শব্দটিই সুপ্রসিদ্ধ কিন্তু "প্রতিবিষয়" বা "প্রত্যর্থ" বলে কোনো পদ প্রসিদ্ধ নয়।[29] তাই লোক প্রসিদ্ধ সেই প্রত্যক্ষ শব্দটির যথার্থ ব্যুৎপাদনের জন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তার ব্যপদেশ করা হয়েছে। এর উত্তরে চন্দ্রকীর্তির বক্তব্য হল, তিনিও পূর্বপক্ষীর সঙ্গে এবিষয়ে সহমত যে, লোকে 'প্রত্যক্ষ' শব্দটিই প্রসিদ্ধ। কিন্তু লোকে যে অর্থে প্রত্যক্ষ শব্দটি ব্যাবহার করা হয় তার দিঙ্নাগের অভিমতের পার্থক্য রয়েছে। লোকে প্রত্যক্ষ বলতে ঘট পট ইত্যাদি বিষয়কেই বোঝানো হয় এবং চন্দ্রকীর্তি সেই লোকপ্রসিদ্ধ অর্থেই প্রত্যক্ষ শব্দটির প্রয়োগ করায় তাঁর বক্তব্যে কোনো দোষ নেই। কিন্তু দিঙ্নাগ নিজে প্রত্যক্ষ শব্দটিকে তার লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ থেকে বিচ্যুত করে কল্পনাপোঢ়রূপ বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করায় বস্তুত প্রত্যক্ষশব্দটির সঙ্গে লোকপ্রসিদ্ধ অর্থের আর কোনো সম্বন্ধ থাকে না। সেক্ষেত্রে নেহাৎ প্রত্যক্ষ পদটি প্রসিদ্ধ হওয়ায় "অক্ষম্ অক্ষম্ প্রতি বর্ততে" ইত্যাকারে যতই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষের সম্যকরূপে ব্যুৎপাদন করা হোক না কেন তা নিষ্প্রয়োজন — নিরর্থক। শব্দের কাজই হল তার অর্থ বা বিষয়কে সূচিত করা। কিন্তু শব্দটি যদি তার অভিপ্রেত অর্থকেই সূচিত করতে না পারে তাহলে সেই পদের কোনো উপযোগিতা থাকে না অথবা প্রয়োজন হলে সেই শব্দটিকে পরিত্যাগ করে ওই বিবক্ষিতার্থের বোধক অন্য শব্দের চয়ন করা বাঞ্ছনীয়। একইভাবে প্রত্যক্ষ শব্দের ব্যুৎপাদন করতে গিয়ে যদি লোক প্রসিদ্ধ অর্থের তিরস্কার করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থের দ্যোতক না হওয়ায় লোকপ্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ শব্দের তিরস্কার করা উচিত। সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বলেও কিছু থাকবে না।[30] প্রত্যক্ষ পদেরলোক প্রসিদ্ধ অর্থ অর্থাৎ ঘট পটাদি বিষয়কে যদি প্রত্যক্ষ পদের দ্বারা সূচিত না করা হয় তাহলে প্রত্যক্ষ শব্দটি পরিত্যাগ করে একে ' প্রত্যর্থ' বা ' প্রতিবিষয়' বলে অভিহিত করা শ্রেয়। কাজেই চন্দ্রকীর্তির বক্তব্য হল— ১ দিঙ্নাগের উচি প্রত্যক্ষ শব্দটিকে তার লোকপ্রসিদ্ধ ঘট-পটাদি অর্থেই প্রয়োগ করা; অথবা ২. দিঙ্নাগ যদি এই লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ বিস্মিত হন, তাহলে তাঁর উচিৎ 'প্রত্যক্ষ' শব্দের তিরস্কার করে 'প্রত্যর্থ' বা ' 'প্রতিবিষয়' শব্দের প্রয়োগ করা। কিন্তু চন্দ্রকীর্তি নিজে লোকপ্রসিদ্ধ যথার্থ অর্থের প্রত্যক্ষ শব্দটির প্রয়োগ করায় তাঁর বক্তব্যে কোনো দোষ নেই।

---

[27] প্রমেয়পরতন্ত্রয়াং চ প্রমাণসংখ্যাপ্রবৃত্তৌ প্রমেয়াকারানুকারিতামাত্রতয়া চ সমাসাদিতাত্মাভাবসত্তাকয়োঃ প্রমাণয়োঃ স্বরূপস্য ব্যবস্থাপনান্নেন্দ্রিয়েণ ব্যপদেশঃ কিঞ্চিদুপকোরোতীতি সর্বথা বিষয়েনৈব ব্যপদেশো ন্যায্যঃ। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫।

[28] ইহ তু প্রমাণলক্ষণবিবক্ষয়া কল্পনাপোঢ়মাত্রস্য প্রত্যক্ষত্বাভ্যুপগমে সতি বিকল্পাদেব তদ্বিশেষত্বাভিমতত্বাদসাধারণকারণেন ব্যপদেশো সতি ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনুপমলভ্যতে। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫।

[29] লোকে প্রত্যক্ষলব্দস্য প্রসিদ্ধত্বাদ্বিবক্ষিতেঽর্থে প্রত্যর্থশব্দস্যাপ্রসিদ্ধত্বাদাশ্রয়েনৈব ব্যুৎপত্তিরাশ্রীয়ত ইতি চেৎ ..। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫।

[30] স তু যথা লোকে, তথা অস্মাভিরূচ্যত এব। যথাস্থিতলৌকিকপদার্থতিরস্কারঃ প্রসিদ্ধঃ স্যাৎ, ততশ্চ প্রত্যক্ষমিত্যেবং ন স্যাৎ। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫।

শুধু তাই নয়, চন্দ্রকীর্তি আরো বলেন যে, "অক্ষম্ অক্ষম্ প্রতি বর্ততে"— প্রত্যক্ষ শব্দের এইরূপ বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব সমাস নিষ্পন্ন ব্যুৎপত্তি থেকেই স্পষ্ট হয় যে, প্রত্যক্ষের উৎপত্তির প্রতি বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের (অক্ষম্ অক্ষম্) অংশগ্রহণ আবশ্যক। কিন্তু চক্ষুরাদি বিজ্ঞানগুলি একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ক্ষণকে অবলম্বন করে উৎপন্ন হয়। কাজেই, বীপ্সার্থের অভাব থাকায় একক্ষণাবচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ বলে অভিহিত যায় না। আর যদি একক্ষণাবচ্ছিন্ন চক্ষুর্বিজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ না বলা যায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই চক্ষুর্বিজ্ঞানাদির ধারাকেও আর প্রত্যক্ষ বলা যায় না।[31]

২.২. কল্পনাপোঢ়ত্বের বিরুদ্ধে চন্দ্রকীর্তির আপত্তি: এতদনন্তর আচার্য চন্দ্রকীর্তি দিঙ্নাগের প্রত্যক্ষের কল্পনাপোঢ়ত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণে সরব হয়েছেন। দিঙ্নাগের মতে, প্রত্যক্ষ কল্পনাপোঢ় হওয়ায় অর্থাৎ নাম,জাতি ইত্যাদি কল্পনা বা বিকল্প রহিত হওয়ায় তা বাচক শব্দের দ্বারা প্রকাশযোগ্য নয় বা অব্যপদেশ্য। চন্দ্রকীর্তির আপত্তি হল, প্রত্যক্ষ যদি অব্যপদেশ্য বা অনভিলাপ্য হয়,তাহলে তার দ্বারা লোকব্যবহার সম্ভব নয়। কিন্তু লোকব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহারকে ব্যাখ্যা প্রদান করাই দিঙ্নাগের লক্ষ্য। কাজেই, দিঙ্নাগের এহেন লক্ষণ সেই কাজে ব্যর্থ হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।[32]

এইরূপ আপত্তির উত্তরে দিঙ্নাগের সপক্ষে কেউ বলতে পারেন যে, যেহেতু আগমে প্রত্যক্ষের কল্পনাপোঢ়ত্ব খ্যাপিত হওয়ায় প্রত্যক্ষের এইরূপ স্বরূপ অবশ্যস্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে আচার্য দিঙ্নাগ তাঁর *প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি*-তে বলেছেন, "অভিধর্মেঽপ্যুক্তম্ — চক্ষুর্বিজ্ঞান সামঙ্গী নীলম্ বিজানতি নো তু নীলম্ ইতি।"[33] দিঙ্নাগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে গিয়ে জিনেন্দ্রবুদ্ধি বলেছেন, এখানে 'নীলম্ বিজানতি' অংশের দ্বারা নীলাদি বিষয়ের অপরোক্ষ অনুভবকে বোঝানো হয়েছে এবং ' নীলম্ ইতি বিজানতি' অংশের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়কে 'নীল' ইত্যাদি নামের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

কিন্তু চন্দ্রকীর্তির মতে, এইরুপ আগমের দ্বারাও প্রত্যক্ষের কল্পনাপোঢ়ত্ব সিদ্ধ হয়না। কেন-না, 'চক্ষুর্বিজ্ঞানসামঙ্গী নীলম্ জানাতি নো তু নীলমিতি' — এই আগমের দ্বারা বস্তুত প্রত্যক্ষ লক্ষণের অভিধান করা হয়নি বরং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, চক্ষুরাদি পঞ্চইন্দ্রিয়বিজ্ঞান থেকে মনোবিজ্ঞানের প্রভেদ প্রদর্শন করা। ফলত, প্রত্যক্ষের কল্পনাপোঢ়ত্ব ব্যবস্থিত না হওয়ায় দিঙ্নাগসম্মত প্রত্যক্ষ লক্ষণ সঙ্গত নয়।[34]

আসলে যে প্রশ্নকে কেন্দ্র করে অভিধর্ম দর্শন সাহিত্যে আলোচ্য আগমটির উল্লেখ করেছেন তা হল, যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিজ্ঞান বিচার-বিতর্ক বা স্বভাববিতর্ক নামক বিকল্পযুক্ত হয় (অর্থাৎ সবিকল্পক হয়) তাহলে ইন্দ্রিয়বিজ্ঞানকে অবিকল্পক (বা কল্পনাপোঢ়) বলা হয় কেন? এই প্রশ্নের ব্যাখা করতে গিয়ে *অভিধর্মকোশে* বলা হয়েছে - "নিরূপণানুস্মরণবিকল্পেনা অবিকল্পাঃ"।[35] অর্থাৎ, পঞ্চইন্দ্রিয়বিজ্ঞান

---

[31] একস্য চ চক্ষুর্বিজ্ঞানস্য একেন্দ্রিয়ক্ষণাশ্রয়স্য প্রত্যক্ষত্বং ন স্যাদ্ বীপ্সার্থাভাবাৎ, একৈকস্য চ প্রত্যক্ষত্বাভাবে বহুনামাপি ন স্যাৎ। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫।

[32] কল্পনাপোঢ়স্যৈব চ জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বাভ্যুপগমাৎ, তেন চ লোকস্য সংব্যবহারাভাবাৎ, লৌকিকস্য চ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারস্য ব্যাখ্যাতুমিষ্টত্বাদ্ ব্যর্থৈব প্রত্যক্ষপ্রমাণকল্পনা সঞ্জায়তে। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫।

[33] প্রমাণসমুচ্চয়বৃত্তি, পৃষ্ঠা-২।

[34] চক্ষুর্বিজ্ঞানসামঙ্গী নীলং জানাতি তো তু নীলামিতি চাগমস্য প্রত্যক্ষলক্ষণাভিধানার্থস্যাপ্রস্তুতত্বাৎ, পঞ্চানামিন্দ্রিয়বিজ্ঞানানাং। জড়ত্বপ্রতিপাদকত্বাচ্চ নাগমাদাপি কল্পনাপোঢ়স্যৈব বিজ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বমিতি ন যুক্তমেতৎ। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫।

[35] অভিধর্মকোশ ।কারিকা-১.৩৩ ক খ, পৃষ্ঠা- ৮৯.

অভিনিরুপণ এবং অনুস্মরণ নামক বিকল্পদ্বয় সম্পৃক্ত না হওয়ায় তাদের অবিকল্পক বলা হয়। তাৎপর্য হল, বৈভাষিক মতে, বিকল্প তিনপ্রকার – ১.স্বভাববিকল্প, ২.অভিনিরূপণ বিকল্প এবং ৩.অনুস্মরণ বিকল্প। এর মধ্যে যদিও পঞ্চইন্দ্রিয়বিজ্ঞান স্বভাববিকল্প যুক্ত হওয়ায় তা সবিকল্পক। তথাপি অভিনিরূপণ ও অনুস্মরণ বিকল্পদ্বয়ের অভাব থাকায় ইন্দ্রিয়বিজ্ঞানগুলিকে অবিকল্পক বা বিকল্পশূন্য বলা হয়। যেরূপ কোনো অশ্বের তিন পদ থাকলেও একটি পদ না থাকায় সেই অশ্বকেও 'পদবিহীন' বলে অভিহিত করা হয়, ঠিক তেমন ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান গুলি স্বভাববিকল্প যুক্ত হওয়ায় সবিকল্পক; তথাপি সেখানে অভিনিরূপণ ও অনুস্মরণরূপ বিকল্প দুটি না থাকায় ইন্দ্রিয়বিজ্ঞানগুলিকে 'অবিকল্পক' বলা হয়।[36] ত্রিবিধ বিকল্পের মধ্যে অভিনিরুপণ বিকল্প হল এক প্রকারের মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রজ্ঞা বা মানসী প্রজ্ঞা। এর মধ্যে অসমাহিত, ব্যগ্র প্রজ্ঞাই অভিনিরূপণ প্রজ্ঞা – সমাহিত প্রজ্ঞা অভিনিরূপণ নয়। একে ব্যগ্র বলা হয় কারণ এটি প্রতি মুহূর্তে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ধাবিত হয়। একে 'অভিনিরুপণ' নামে অভিহিত করা হয় কেননা এটি বস্তুতে নাম আরোপ করে এবং 'এটি বেদনা' 'এটি রুপ' ইত্যাদি আকারে বিষয়ের পরীক্ষা বা নিরুপণ করে থাকে। অন্যদিকে, অনুস্মরণ বিকল্প হল একপ্রকারের মানস স্মৃতি – যা সমাহিত বা অসমাহিত উভয়ই হতে পারে। বস্তুতপক্ষে চক্ষুরাদি পঞ্চইন্দ্রিয়বিজ্ঞানগুলিতে এই দুই বিকল্প না থাকায় সেগুলি 'এটি নীল' ইত্যাদি বস্তুতে নামের অভিধান বা 'এটি রুপ' ইত্যাকারে পরীক্ষাও করতে পারেনা। সেগুলি কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞান বা মানসী প্রজ্ঞার ক্ষেত্রেই সম্ভব। বস্তুত এর দ্বারাই চন্দ্রকীর্তির বক্তব্যের সারসত্তা প্রমাণিত হয়। কারণ ইন্দ্রিয়বিজ্ঞানগুলি যদিও প্রজ্ঞা বা বিজ্ঞানস্বরুপ তথাপি এগুলি (অভিনিরূপণ ও অনুস্মরণ বিকল্পদ্বয়ের অভাববশত) 'এটি অমুক' ইত্যাকারে বস্তুনিশ্চয় বা নামের আরোপ করতে পারেনা। এই অর্থে ইন্দ্রিয়বিজ্ঞানগুলি জড়বৎ। কিন্তু এর বিপরীতে মনোবিজ্ঞানগুলি কোনো বিষয়কে 'এটি অমুক' ইত্যাকারে নামসহকারে নিশ্চয় জ্ঞান প্রদান করে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক Dan Arnold মহাশয়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য –

> In fact, the context for Yaśomitra's citation of the passage... recommends Candrakīrti's point; for Yaśomitra adduces the quotation in commenting on the part of Vasubandhu's text that treats the cognitive outputs of the five non-mental senses — and the point of the passage is (as Candrakīrti goes on to say) thus to urge simply that the outputs of the five sense faculties are not meaningful until they have become the objects, as well, of the manovijñana. This quotation, as deployed by these Ābhidhārmikas, therefore indeed does not state a definition of perception, but instead makes a characteristically Ābhidhārmika point about the relationship between the five bodily "vijñanas" and the manovijñana.[37]

কাজেই, উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায়, চন্দ্রকীর্তি এইবিষয়ে সঠিক যে, উক্ত আগমের লক্ষ্য প্রত্যক্ষ লক্ষণ প্রদান নয় বরং পঞ্চইন্দ্রিয়বিজ্ঞানের মনোবিজ্ঞান অপেক্ষা জড়ত্ব প্রতিপাদন

---

[36] স্বভাববিকল্পো বিতর্কঃ। স এষাৎ পঞ্চানাং বিজ্ঞানকায়ানাং সম্প্রযোগিতোহস্তি। তস্মাৎ সবিকল্পা উক্তা। নেতরাবভিনিরূপণানুস্মরনণবিকল্পাবেষাং স্তুঃ তস্মাদবিকল্পা উচ্যন্তে। যথৈকপাদকোহশ্বোহপাদক ইত্যুচ্যতে। তদ্বদৈকবিকল্পা অবিকল্পা ইতি। যশোমিত্র, বসুবন্ধুর অভিধর্মকোশের উপরি রচিত *স্ফুটার্থটীকা*, পৃষ্ঠা – ৮৯-৯০.

[37] Arnold, Dan, "Materials for a Mādhyamika Critique of Foundationalism: An Annotated Translation of Prasannapadā 55.11 To 75.13", p. 460. footnote.

করা বা তাদের মধ্যে প্রভেদ প্রদর্শন করা। ফলত, কল্পনাপোঢ়ত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় 'প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ং' দিঙ্নাগের এহেন প্রত্যক্ষ লক্ষণ গ্রহণযোগ্য নয়।

এইভাবে দিঙ্নাগের প্রত্যক্ষ লক্ষণের খন্ডনের অনন্তর আচার্য চন্দ্রকীর্তি প্রত্যক্ষ সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

প্রত্যক্ষ সম্পর্কে চন্দ্রকীর্তির অভিমত: বৌদ্ধ প্রমাণশাস্ত্রের ইতিহাসে চন্দ্রকীর্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল *সম্ভবত* তিনিই সর্বপ্রথম প্রাসঙ্গিক-মাধ্যমিক দর্শনের আলোকে প্রত্যক্ষ তথা সামগ্রিকভাবে প্রমাণ বিষয়ক সদর্থক আলোচনা করেন। চন্দ্রকীর্তির পূর্বসুরীদের মধ্যে মধ্যমক দর্শনের সংস্থাপক আচার্য নাগর্জুন তাঁর *বৈদল্যসূত্র* ও *প্রকরণ* , *বিগ্রহব্যাবর্তনী* ইত্যাদি গ্রন্থে বিতন্ডার দ্বারা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রতিষেধ করেছেন। এমনকি নাগার্জুনোত্তর কালে আর্যদেব, বুদ্ধপালিত প্রমুখ মাধ্যমিকাচার্যগণও প্রমাণ বিষয়ক সদর্থক আলোচনা থেকে বিরত থেকেছেন। কিন্তু চন্দ্রকীর্তিই সর্বপ্রথম তাঁর *প্রসন্নপদা*-য় লোকব্যবহারের অনুসারী প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম ও উপমান এই প্রমাণ চতুষ্টয়ের উল্লেখ ও লক্ষণ প্রদান করেছেন। কাজেই, প্রাসঙ্গিক-মাধ্যমিক দর্শনে প্রত্যক্ষ তথা প্রমাণ বিষয়ক সদর্থক বক্তব্যের প্রস্তাবক হিসেবে চন্দ্রকীর্তির অবদান অনস্বীকার্য।

এখন কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আচার্য নাগার্জুন তাঁর বিভিন্ন রচনায় যুক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের খন্ডন করেছেন। কিন্তু চন্দ্রকীর্তি *প্রসন্নপদা*-য় প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয়কে স্বীকার করেছেন। কাজেই, স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে, তাহলে কি চন্দ্রকীর্তি শাস্ত্রকার নাগার্জুনের বিরুদ্ধাচরণ করছেন? অথবা তিনি কি মধ্যমকশাস্ত্রের মূল বক্তব্য থেকে সরে যাচ্ছেন?

এর উত্তরে বলা যায়, আপাতদৃষ্টিতে শাস্ত্রকার নাগার্জুন ও বৃত্তিকার চন্দ্রকীর্তির বক্তব্য পরস্পর বিরোধী মনে হলেও বস্তুত তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। আচার্য নাগার্জুন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে পারমার্থিক দৃষ্টিতে প্রমেয় পদার্থ (real entity) হিসেবে প্রমাণের খন্ডন করেছেন। অন্যভাবে বলা যায়, নাগার্জুন সত্তাতাত্ত্বিক দিক (ontologically) থেকে প্রমাণের শূন্যতা প্রতিপাদন করেছেন। নাগার্জুনের মতো চন্দ্রকীর্তিও এবিষয়ে সহমত যে, *পারমার্থিক দৃষ্টিতে* অন্যান্য ভাব পদার্থের মতো প্রমাণের অস্তিত্ব স্বীকৃত নয় বা অন্যভাবে বলা যায়, সত্তাগত দিক থেকে প্রমাণও স্বভাবশূন্য (ontologically empty)। অবশ্য চন্দ্রকীর্তি *প্রসন্নপদা*-য় সত্তাগত দিক থেকে নয় বরং জ্ঞানতাত্ত্বিক থেকে (epistemologically) প্রমাণের আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ এখানে তিনি *লোকব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ* থেকে কখন একটি জ্ঞানকে যথার্থ বা প্রমাণ বলা যায় তার আলোচনা করেছেন। চন্দ্রকীর্তির মতে প্রমাণ স্বরূপত শূন্য বা নিঃস্বভাব হলেও তা যথার্থ জ্ঞান প্রদান করতে পারে বা তা জ্ঞানগতভাবে অবিসংবাদি হতে পারে। প্রমাণগুলি নিজ বিষয় বা প্রমেয়ের সাপেক্ষেই নিজের প্রমাণ চরিত্র লাভ করে। কাজেই বলা যায়, মাধ্যমিক শূন্যবাদের সঙ্গে কোনোরূপ আপোষ না করেই চন্দ্রকীর্তি আমাদের সামনে এমন এক অভিনব জ্ঞানতাত্ত্বিক উপায় বা কৌশল (epistemological tool or device) উপস্থাপন করেছেন যার সাহায্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোন জ্ঞানটি যথার্থ বা প্রমাণ আর কোনটি অযথার্থ বা অপ্রমাণ — তা নির্ধারণ করা যায়। ফলত, নাগার্জুন ও চন্দ্রকীর্তির প্রমাণ সংক্রান্ত আলোচনার অভিমুখ ভিন্ন উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

বিষয় টিকে আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য প্রত্যক্ষের লক্ষণ আলোচনার পূর্বে চন্দ্রকীর্তি সামান্যতঃ প্রমাণ বলতে কী বুঝিয়েছেন, সেই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে। অবশ্য চন্দ্রকীর্তি

প্রসন্নপদা-য় প্রমাণের কোনো সামান্য লক্ষণ প্রদান না করলেও *চতুঃশতকটীকা*-য় তিনি বলেছেন— 'লোকে অবিসংবাদক জ্ঞানকেই প্রমাণ বলা হয়'[38] । চন্দ্রকীর্তি এখানে প্রমাণের লক্ষণ প্রসঙ্গে দুটি পদের উল্লেখ করেছেন — ১. অবিসংবাদক জ্ঞান এবং ২. লোক। প্রথমত, অবিসংবাদক জ্ঞানকে প্রমাণ বলার মধ্য দিয়ে চন্দ্রকীর্তি প্রমাণের সামান্য লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, বিষয় যেমন তাকে অবিপরীত জানা বা তদ্বিষয়ক অবিসংবাদী জ্ঞানই প্রমাণের লক্ষণ। অভিপ্রায় এই যে, চন্দ্রকীর্তির মতে, বিষয় বা প্রমেয়ই জ্ঞানগত অবিসংবাদকত্বের নির্ধারক; এই অবিসংবাদকত্ব প্রমাণের নিজের স্বভাব নয়। কোন একটি জ্ঞান প্রমাণ না কি অপ্রমাণ বলে বিবেচিত হবে তা প্রমেয় বা বিষয়টি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট অনুসারে যে রূপে প্রতিভাত হচ্ছে, তাকে অবিপরীতভাবে জানারূপ শর্তের উপর নির্ভরশীল। বিষয়ের অবিপরীত বা অবিসংবাদক জ্ঞানই হল প্রমাণ এবং বিষয়ের বিপরীত বা বিসংবাদক জ্ঞান হল অপ্রমাণ।

অন্যদিকে, দ্বিতীয়ত, 'লোক' পদটির সন্নিবেশের দ্বারা সেই প্রেক্ষাপটকে (context) নির্দেশ করেছেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে অবিসংবাদী জ্ঞান বা বিষয়ের অবিপরীত জ্ঞান প্রমাণরূপে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ, (লৌকিক) প্রমাণের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অবিসংবাদীত্বকে কঠোরভাবে লোকের অন্তর্ভুক্তরূপে বা লোকব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। চন্দ্রকীর্তি তাই *প্রসন্নপদা*-য় বলেছেন — "তদেবং প্রমাণচতুষ্টয়াল্লোকস্যার্থধিগমো ব্যবস্থাপ্যতে।"[39] অর্থাৎ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগুলি কেবলমাত্র লৌকিক বিষয়ের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই কার্যকরী; পারমার্থিক দৃষ্টিতে নয়। কাজেই, চন্দ্রকীর্তির মতে, সংবৃতি সৎ বা লোকব্যবহারে পদার্থসমূহ যেরূপে প্রতিভাত হয়, তাদের অবিপরীতভাবে জানা হল প্রমাণ আর তদ্বিষয়ক বিপরীত জ্ঞান হল অপ্রমাণ। উদাহণস্বরূপ, নির্দোষ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট সকল ব্যক্তিই ঘটকে বলে বা শ্বেত বস্তুকে শ্বেতরূপেই দর্শন করেন বা ওই সকল বস্তু সম্পর্কে তারা সহমত পোষণ করেন। তাই সুষ্ঠ ইন্দ্রিয়বান ব্যক্তির ঘট,পট, শ্বেত বস্তু ইত্যাদি বিষয়ক যে জ্ঞান তা লোকব্যবহারের অনুসারী হওয়ায় তা প্রমাণ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যিনি তিমির রোগগ্রস্থ তিনি এক চন্দ্রকে দ্বিচন্দ্ররূপে দর্শন করেন বা যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় কামল রোগগ্রস্থ তিনি শ্বেত পীতবর্ণ বিশিষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করেন। এগুলি লোকের দৃষ্টিতে মিথ্যা। কাজেই, তিমির বা কামলাদি দোষদুষ্ট ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট ব্যক্তির এই দ্বিচন্দ্র দর্শন বা পীতবর্ণের দর্শন(যাকে চন্দ্রকীর্তি অ-লোক সংবৃতি বলেছেন) তা লোকব্যবহারের দ্বারা বাধিত হওয়ায় লোকের সাপক্ষে তা অপ্রমাণ বলে বিবেচিত হয়— এটাই চন্দ্রকীর্তির অভিপ্রায়। একই সঙ্গে, এর দ্বারা, ঘট পটাদি লৌকিক বা সংবৃতি সৎ পদার্থ আবার পরমার্থ সত্যের দৃষ্টিতে মিথ্যা হওয়ায় লৌকিক প্রমাণগুলির অবিসংবাদকত্ব যে কেবল লোকসংবৃতির ক্ষেত্রেই কার্যকরী; তারা পরমার্থ সত্যের সাপেক্ষে তা প্রমাণ নয় — তাও সূচিত হয়েছে। পূর্বে প্রত্যক্ষের আলোচনাতেও এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সেখানে চন্দ্রকীর্তি স্পষ্টই বলেছেন— " তত্ত্ববিদপেক্ষয়া হি—প্রত্যক্ষত্বং ঘটাদিনাং নীলাদীনাং চ নেষ্যতে। লোকসংবৃত্যা ত্বভ্যুপগন্তব্যমেব প্রত্যক্ষত্বং ঘটাদীনাম্।[40]

---

[38] "…a non-belying (mi slu ba = avisamvadin) consciousness is regarded as being a pramana in the world…" see, Tillemans, Tom J F, Materials *for The Study of Āryadeva Dharmapāla and Candrakīrti* Vol.1, sec.16, p.179.

Prof. Tom J F Tillemans in his book presented an English Translations of a portion of Candrakīrti's *Catuḥśataka*tīka from the fragments of Sanskrit, Tibetan and Chinese sources.

[39] *প্রসন্নপদা,* পৃষ্ঠা- ২৫.

[40] তদেব, পৃষ্ঠা - ২৪.

অর্থাৎ পারমার্থিক বা তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঘট- নীলাদির প্রত্যক্ষ স্বীকৃত নয়; কেবলমাত্র লোক ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই ঘট, নীলাদির প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করা যায়।

এখন, চন্দ্রকীর্তি লোকব্যবহারে প্রত্যক্ষ বলতে কি বুঝিয়েছেন তা আলোচনা করা যেতে পরে।লোকব্যবহারের অনুসারী প্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রদান করতে গিয়ে চন্দ্রকীর্তি তাঁর *প্রসন্নপদা*-য় বলেছেন — "তস্মাল্লোকে যদি লক্ষ্যং যদি বা স্বলক্ষণং সামান্যলক্ষণং বা সর্বমেব সাক্ষাদুপলভ্যমানত্বাদপরোক্ষম্; অতঃ প্রত্যক্ষং ব্যবস্থাপ্যতে তদ্বিষয়েণ জ্ঞানেন সহ।"[41] অর্থাৎ, লোকব্যবহারে কোনো বিষয় — তা লক্ষ্য হোক্ অথবা স্বলক্ষণ অথবা সামান্যলক্ষণ — যা কিছু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে গৃহীত হয় বা অপরোক্ষ বিষয়, তাকেই প্রত্যক্ষ বলা হয়। অন্যদিকে সেই অপরোক্ষ বিষয়ের গ্রাহক বিজ্ঞানকেও গৌণ অর্থে প্রত্যক্ষ বলে অভিহিত করা হয়। কাজেই, চন্দ্রকীর্তির দর্শনে প্রত্যক্ষ বলতে মুখ্যত ঘট-পটাদি বিষয়কে বোঝানো হয় — জ্ঞানকে নয়। কোনটি প্রত্যক্ষ বলে বিবেচিত হবে এবং কোনটি নয়, বিষয়ই তার মানদন্ড নির্ধারণ করে। এই লক্ষণে অপর যেটি গুরুত্বপূর্ণ তাহল লোকের ধারণা। লোকে যে বিষয় যেরূপে অবস্থিত, সেই সকল অপরোক্ষ বিষয়ই প্রত্যক্ষ।

চন্দ্রকীর্তি ভ্রমপ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও একই নীতির প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন - "দ্বিচন্দ্রাদীনাং তু অতৈমিরক জ্ঞানাপেক্ষয়া অপ্রত্যক্ষত্বম্। তৈমিরকাদ্যপেক্ষয়া তু প্রত্যক্ষত্বমেব।"[42] অর্থাৎ দ্বিচন্দ্রাদি দর্শন, যিনি তিমিররোগগ্রস্থ নয় বা অতৈমিরকের সাপেক্ষে অপ্রত্যক্ষ হয়, যিনি তিমিররোগগ্রস্থ বা তৈমিরক, তার সাপেক্ষে অবশ্যই প্রত্যক্ষ বলে বিবেচিত হবে। চন্দ্রকীর্তির এহেন বক্তব্য থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে তার বক্তব্য স্ববিরোধী বা তিনি সত্যজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞানের ভেদকে সম্পূর্ণরুপে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু বস্তুত তা সত্য নয়। এই আপাতবিরোধ অনায়াসেই দূর করা যাবে যদি আমরা স্মরণে রাখি কোন প্রেক্ষাপট (Context) থেকে চন্দ্রকীর্তি কোনো বিষয়কে প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ বলেছেন। চন্দ্রকীর্তির প্রমাণ সংক্রান্ত ধারণাকে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে এই প্রেক্ষাপটের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চন্দ্রকীর্তির বক্তব্য হল - ১। যিনি তিমিররোগগ্রস্থ নন, তার দৃষ্টিকোণ থেকে বা লোকব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বিচন্দ্রাদির দর্শন অবশ্যই অপ্রত্যক্ষ (অপ্রমাণ)। কেন-না, আমরা সাধারণভাবে একচন্দ্রকেই প্রত্যক্ষ করি; দ্বিচন্দ্র দর্শন করিনা। কিন্তু ২। যিনি তিমির রোগগ্রস্থ তিনি একটি চন্দ্রকেই দুটি রূপে দর্শন করেন। ফলত, তার দৃষ্টিকোণ থেকে — যাকে চন্দ্রকীর্তি অন্যত্র অ-লোকসংবৃত্তি বলেছেন — তার সাপেক্ষে সেটি অবশ্যই প্রত্যক্ষ (তথা প্রমাণ) বলে বিবেচিত হবে।

স্পষ্টতই এখানে চন্দ্রকীর্তি ভ্রমজ্ঞানের সার্বত্রিক প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করছেন না। তিনি কেবল এইটুকুই বলছেন যে, ভ্রমপ্রত্যক্ষকে আমরা ততক্ষণই যথার্থ বলে দাবী করতে পারি, যতক্ষণ না সেই ভ্রমজ্ঞানের বিষয়টি —তা যতই অলীক বা অসৎ হোক কেন — তা ওই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট সম্যকভাবে জ্ঞাত হচ্ছে। শঙ্খ যে শ্বেতবর্ণের, তা পীতবর্ণের নয় অথবা চন্দ্র যে একটিই, দ্বিচন্দ্রের অস্তিত্ব নেই — তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যে ব্যক্তি কামল বা তিমিররোগগ্রস্থ তিনি শ্বেত শঙ্খকে পীতবর্ণেরই প্রত্যক্ষ করেন বা একচন্দ্রকে দ্বিচন্দ্ররুপেই দর্শন করেন। সেই দ্বিচন্দ্র বা পীতবর্ণ বাস্তবিকপক্ষে

[41] তদেব, পৃষ্ঠা -২৫

[42] তদেব, পৃষ্ঠা - ২৫.

অলীক হলেও তা ওই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দোষদুষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেইরুপেই গৃহীত হওয়ায় তাকে প্রত্যক্ষ বলতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, দ্বিচন্দ্রাদি দর্শনের প্রত্যক্ষত্ব স্বীকারের পশ্চাতে দুটি কারণ বিদ্যমান—১। ভ্রম প্রত্যক্ষ 'দ্বিচন্দ্র', 'পীতশঙ্খ' ইত্যাদি অসৎ বিষয়কে অবলম্বন করেই উৎপন্ন হয় এবং ২। ভ্রম প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে দ্বিচন্দ্র ইত্যাদি বিষয় ঐ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা অপরোক্ষ ভাবে গৃহীত হওয়ায়, প্রত্যক্ষ বলে বিবেচিত হওয়ার আবশ্যিক শর্ত তাতে বিদ্যমান। তাই তা সেই তিমিরাদি রোগগ্রস্থ ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণ। কাজেই, প্রেক্ষাপট বা দৃষ্টিকোণের পার্থক্য থাকায় চন্দ্রকীর্তির বক্তব্যের মধ্যে কোনো স্ববিরোধিতা নেই তা বলাবাহুল্য।

নিষ্কর্ষ: কাজেই, সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে চন্দ্রকীর্তির যে বক্তব্য গুলি ফুটে উঠেছে, সেগুলি হল –

1. প্রথমত, চন্দ্রকীর্তি প্রত্যক্ষ বলতে মুখ্যত ঘট, পট ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে গৃহীত বা অপরোক্ষ বিষয়কে বুঝিয়েছেন এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে তিনি গৌণঅর্থে প্রত্যক্ষ বলছেন।
2. দ্বিতীয়ত, দিঙ্নাগের বিপরীতে চন্দ্রকীর্তির মতে, প্রত্যক্ষের উৎপত্তির প্রতি ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা গৌণ এবং বিষয়ের ভূমিকাই মুখ্য।
3. তৃতীয়ত, কোনো প্রত্যক্ষ যথার্থ বা অভ্রান্ত হবে কি না — তা ওই সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে অবিপরীতভাবে জানার উপর নির্ভর করে। লোকে কোনো একটি বিষয় যেরূপে অবস্থিত সেই বিষয়টিকে সেইরূপেই (অবিপরীতভাবে) জ্ঞাত হলে (লৌকিক দৃষ্টিতে) প্রত্যক্ষটি অভ্রান্ত বা যথার্থ হয়; অন্যথায় ভ্রান্ত বা অযথার্থ হয়।
4. চতুর্থত, দিঙ্নাগের মতে কেবলমাত্র স্বলক্ষণ পদার্থই প্রত্যক্ষের বিষয়; সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। কিন্তু চন্দ্রকীর্তির মতে, স্বলক্ষণ ও সামান্যলক্ষণ পদার্থ উভয়েই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়।
5. পঞ্চমত, দিঙ্নাগের মতে প্রত্যক্ষজমাত্রই কল্পনাপোঢ় বা বিকল্পশূন্য হলেও চন্দ্রকীর্তির মতে সবিকল্পক জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হতে পারে।
6. ষষ্ঠত, প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে লোকব্যবহার বা সংবৃতি সত্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রূপাদি স্বলক্ষণ হোক বা ঘট পটাদি সামান্যলক্ষণ পদার্থের প্রত্যক্ষত্ব কেবলমাত্র লোকব্যবহারের সাপেক্ষেই স্বীকৃত বা সেগুলি লোকসংবৃতির সাপেক্ষই প্রমাণ; তত্ত্ব বা পরমার্থসত্যের সাপেক্ষে তাদের প্রত্যক্ষ বলা যায় না। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ঘট-নীলাদি লৌকিক পদার্থসমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না হওয়ায় তাদের প্রত্যক্ষত্ব স্বীকৃত নয়। আবার, দ্বিচন্দ্রাদিদর্শন ইত্যাদি

অ-লোকসংবৃত্তির সাপেক্ষে প্রত্যক্ষ (প্রমাণ) হলেও লোকসংবৃত্তির সাপেক্ষে তা মিথ্যা — প্রমাণ নয়; কাজেই, লোক সংবৃতি বা লোকব্যবহারই প্রত্যক্ষ (তথা সকল প্রমাণের) প্রামাণ্যের নির্ধারক।

সর্বোপরি, চন্দ্রকীর্তির প্রত্যক্ষ তথা প্রমাণ সংক্রান্ত আলোচনার প্রাণকেন্দ্র হল শূন্যতার ধারণা। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ গুলি তার বিষয় বা প্রমেয়সাপেক্ষে অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপন্ন (mutually dependent)। এই অর্থেই

তারা শূন্য বা স্বভাব শূন্য। প্রমাণ ও প্রমেয় পরস্পরের সাপেক্ষই সিদ্ধ হয়; প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগুলো সস্বভাবত সিদ্ধ নয়।[43]

কাজেই বলা যায়, প্রাসঙ্গিক-মাধ্যমিক দর্শনের আলোকে চন্দ্রকীর্তির প্রত্যক্ষ বিষয়ক আলোচনা বৌদ্ধ প্রমাণশাস্ত্রের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

[43] তানি চ পরস্পরাপেক্ষয়া সিধ্যন্তি—সৎসু প্রমাণেষু প্রমেয়ার্থাঃ, সৎসু প্রমেয়েষ্বর্থেষু প্রমাণানি নো তু খলু স্বাভাবিকী প্রমাণপ্রমেয়য়োঃ সিদ্ধিরিতি। তদেব, পৃষ্ঠা -২৫।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1. Vaidya, P.L., (Ed.) Madhyamaka Shāstra of Nāgārjuna with the commentary Prasannapadā by Candrakīrti, The Mithila Institute of Post Graduate Studies and Research, Dharbhanga,1960.
2. Steinkellner, Ernst, (Ed.) Dignāga's Pramaṇasamuccaya,Chapter 1. A hypothetical reconstruction of the Sanskrit text with the help of the two Tibetan translations on the basis of the hitherto known Sanskrit fragments and the linguistic materials gained from Jinendrabuddhit's Ţīkā, Vienna, 2005. URL: http://www.oeaw.ac.at/ias/Mat/dignaga_PS_1.pdf
3. Śāstri, Swāmi Dwārikadās (Ed.), Abhidharmakosa & Bhāşya of Ācārya Vasubandhu with Sphutārthā commentary of Ācārya Yaśomitra, Bauddha Bharati, Varanasi, 1987.
4. Hattori, Maaskai, Dignāga, on Perception being the Pratyakşapariccheda of Dignāga's Pramāna Samuccaya, from the Sanskrit fragments and the Tibetan versions, Harvard University Press,1968.
5. Āryadeva, Catuḥśatakaṃ Along with the Candrakīrti's Vṛtti ,Dr. Bhagchandra Jain Bhaskar (Ed. & Trans.), Alok Prakashan, Nagpur, 1971.
6. Tillemans, Tom J F, Materials for The Study of Āryadeva Dharmapāla and Candrakīrti Vol.1, WIEN,1990.
7. Siderits, Mark. "The Madhyamaka Critique of Epistemology II." Journal of Indian Philosophy, Vol. 9, No. 2, 1981, pp. 121–60.
8. Arnold,Dan, "Materials for a Madhyamika Critique of Foundationalism: An Annotated Translation of Prasannapdā 55.11 to 75013", Journal of International Association of Buddhist Studies, Vol 28, No 2, pp. 411-67.
9. . Chattopadhyay, Madhumita, Walking Along the Path of Buddhist Epistemology, D.K. Printworld Pvt. Ltd., New Delhi,2007
10. ধর্মকীর্তি, ন্যায়বিন্দু (আচার্য ধর্মোত্তরের ন্যায়বিন্দুটীকা সহ), সঞ্জিত কুমার সাধুঁকা (সম্পা.), সদেশ, কলকাতা, ২০০৭.